সঙ্ঘভাবনা : স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, প্রেমানন্দ ও সারদানন্দ

স্বামী বলভদ্রানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূচনা শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে। এই কথার অর্থ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে উপজীব্য করেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, তেমনই সময়ের হিসেবেও শ্রীরামকৃষ্ণ থেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূচনা। প্রথম উন্মেষ, যখন তাঁর সব সাধনার শেষে জগন্মাতা তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর জীবনে তিনি যেসব উদারভাব আচরণ ও অনুভব করেছেন, তার ধারক ও বাহকরূপে একটি নবীন সম্প্রদায় তাঁকে গড়ে তুলতে হবে। সেই সঙ্ঘ যাঁদের স্তম্ভ করে গড়ে উঠবে তাঁদের মুখচ্ছবি ও পরিচয়ও জগজ্জননী তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তার প্রায় এক দশক পরে নরেন্দ্র প্রমুখের আগমন তাঁর কাছে। তাঁদেরকে অমোঘ ভালবাসায় বেঁধে স্নেহ ও শিক্ষাদানে তখন থেকেই সঙ্ঘের সূচনা—যাঁদের গাঁথছিলেন সঙ্ঘমালিকায়, তাঁদেরও অজ্ঞাতসারে। ক্রমশ সঙ্ঘ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ বছরটিতে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে। সঙ্ঘের এই অঙ্কুর পর্যায়েই পরিষ্কার হয়ে যায় ভাবী সঙ্ঘের নেতা কে হবেন। ভাবী সন্ন্যাসীদের কাছে এও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অবগুণ্ঠনবতী ও লজ্জাপটাবৃতা থেকেও তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক সমষ্টিজীবনে চিরকালের মতো সম্পৃক্ত হয়ে গেছেন তাঁদের গুরুমাতা শ্রীমা সারদা দেবী। সঙ্ঘনেতা তাঁকে 'সঙ্ঘজননী'রূপে ঘোষণা করবেন গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের প্রায় এক দশক পর, সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার দিনই (১৮৯৭-এর ১ মে)।

দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যথাসর্বস্ব শক্তি নরেন্দ্রনাথকে দান করে দিয়ে তাঁকে বলেছিলেন জগতের কাজে সেই শক্তি ব্যবহার করতে। এরও দু-একদিন পরে তিনি সুস্পষ্টভাবে তাঁর ভাবী সন্ন্যাসিশিষ্যদের দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত করে বলেছিলেন, ''তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।'' পরবর্তী কালে জানা গেছে এই সময় তিনি সারদা দেবীকেও তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা 'যেখানে যা দেখেছেন—শিলটি নোড়াটি', সেখানেই ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানদের জন্য প্রার্থনা

করেছেন। সেইসময় স্বামীজী ছাড়া একমাত্র তিনিই বুঝেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু শেষ হয়ে গেল না—একটি সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়ে উঠবে যার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জগৎকল্যাণব্রত কার্যকর থাকবে। মা যে প্রার্থনা করতেন—''ওরা সব (অর্থাৎ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা) তোমাকে আর তোমার সব ভাব উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে, আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে''—তা স্বামীজীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' ব্রতেরই ভাষান্তর।

স্বামীজীর গুরুভাইরা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকাকালীন, বিশেষত তাঁর অন্ত্যলীলার দিনগুলিতে, শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণের পাশাপাশি আর-একটি অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করতেন। সে-আকর্ষণটিও এতই শক্তিশালী যে শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে সেটি হারিয়ে না গিয়ে স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে বড় আকর্ষণটির পরিপূরকরূপে কাজ করেছিল এবং সঙ্ঘবন্ধনকে দৃঢ় করেছিল। সেটি তাঁদের প্রায় সমবয়স্ক গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথের আকর্ষণ। স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন, এই উভয় ভালবাসার আকর্ষণে তাঁদের মধ্যে এমন একটি আত্মিক বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল যে, এক পরিবারের ব্যক্তিদের চেয়েও 'তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্যসত্য জ্ঞান করিতে লাগিল।' স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, তাঁদের একজনের গায়ে চিমটি কাটলে আর-একজন যেন 'উঃ' করে উঠতেন।

স্বামীজী তাঁর অনবদ্য চরিত্র, অলৌকিক প্রতিভা এবং অপার ভালবাসার গুণে তাঁর গুরুভ্রাতাদের অকুণ্ঠ প্রেম ও আনুগত্য লাভ করেছিলেন। নেতৃত্বের পরম লক্ষণ যে-আন্তরিক সেবকভাব, যেকথা তিনি নিজেই একাধিক বার বলেছেন, সেই সেবকভাব তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই আধুনিক 'করপোরেট' পরিভাষায় যাঁরা সার্থক 'লিডার' তাঁদের মতোই স্বামীজী সঙ্ঘ-সম্পর্কিত তাঁর স্বপ্ন ও ভাবনাগুলি গুরুভাইদের কাছে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে সেগুলিকে তাঁদেরও নিজস্ব ভাবনায় পরিণত করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া, সঙ্ঘের মূল কেন্দ্রটি বেলুড় মঠে স্থায়ীভাবে উঠে আসার আগেই তিনি (আলমবাজার ও নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে মঠ থাকাকালীন) মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্য ১৪০ টি নিয়ম প্রণয়ন করেছিলেন, যেগুলি তাঁর গুরুভাইদের জন্য ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দুটি প্রয়োজনীয় বিষয় স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দিয়েছিল : প্রথমত মোক্ষলাভ, যেখানে উপনীত হতে হবে, দ্বিতীয়ত সেই লক্ষ্য অভিমুখে চলার জন্য প্রতিদিনের পথনির্দেশ। তাঁর গুরুভাইরা প্রত্যেকেই জীবনের সেই পরম লক্ষ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও কৃপাগুণেই। কিন্তু তাঁদেরও বোঝার প্রয়োজন ছিল, নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ থেকে এই মহান সঙ্ঘকে কোন পরম লক্ষ্যের দিকে নিত্য চালিত করবেন এবং কোন পথ অবলম্বন করে তা করতে হবে। সেগুলি সবই স্বামীজী সুস্পষ্টভাবে ওই নিয়মাবলির মধ্যে লিখে গেছেন। তাছাড়া প্রকৃত নেতার অনেক কর্তব্যের মতো আর-একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যও তিনি পালন করে গেছেন মহাপ্রয়াণের আগে। সেটি হল, গুরুভাইদের বেশ কয়েকজনকে নেতায় পরিণত করে গেছেন। তাঁর দেহত্যাগের পর যখনই প্রয়োজন হয়েছে, সঙ্ঘজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা এসে হাল ধরেছেন। বিবেকানন্দের প্রতিভাচ্ছটার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রেখেই যাঁরা এতদিন সম্পূর্ণ তৃপ্ত ছিলেন, তাঁদের নেতৃত্বশক্তি দেখে তখন আমরা বিস্মিত হয়েছি। বুঝেছি, স্বামীজীর 'জহুরি দৃষ্টি' কত অভ্রান্ত! বিবেকানন্দ-পরবর্তী সেই নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই প্রবন্ধে আমরা চারজনকে বেছে নিয়েছি : স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী

প্রেমানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্বন্ধে এই মহাপুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, সেটিই আমরা এখন আলোচনা করব। এবং তা যেমন করব সঙ্ঘ-সম্পর্কিত তাঁদের সুস্পষ্ট উপদেশের মাধ্যমে, ততোধিক তাঁদের জীবন ও কর্মের মাধ্যমে। কারণ তাঁদের জীবনও তাঁদের বাণী। বরং তাঁদের জীবন ও কর্ম অধিকতর বাঙ্ময় তাঁদের উচ্চারিত বাণীসমূহের চেয়ে।

গুরুভাইদের মধ্যে একমাত্র যাঁকে স্বামীজী 'অভিন্নহৃদয়েষু' বলে চিঠিপত্রে সম্বোধন করেছেন, তিনি হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। 'রাখালের রাজবুদ্ধি আছে'—ঠাকুরের কাছে একথা শুনেই স্বামীজী তাঁকে 'রাজা' বলে ডাকতে শুরু করেছিলেন। স্বামীজী 'রাজা' বলতেন বলেই আমাদের কাছে তিনি হয়ে গেছেন 'রাজা মহারাজ'। বয়সে ন-দিনের ছোট হলেও স্বামীজী একবার তাঁকে প্রণাম করে বলেছিলেন, ''গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।'' রাজা মহারাজও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রতিনমস্কার করে বলেছিলেন, ''জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমঃ পিতা।'' স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''রাখাল আমাদের মঠের শোভা।'' ''রাখালের আধ্যাত্মিকতা আঁকড়ে পাওয়া যায় না।'' রাখাল আধ্যাত্মিকতায় তাঁর চেয়েও বড়। স্বামীজীর দেহত্যাগের দিন শোকার্ত মহারাজ বলেছিলেন, ''সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল।'' কিন্তু সেই তিনিই পরিস্থিতির প্রয়োজনে উপযুক্ত উচ্চতায় উঠে এরপর কুড়ি বছর সঙ্ঘকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন অপূর্ব দক্ষতায়। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং প্রবল সাধারণ বুদ্ধির জন্য, তাঁর নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও অসীম করুণার জন্য, এবং সর্বোপরি সহজাত রাজবুদ্ধি এবং দুর্লভ ব্রহ্মবুদ্ধির অনুপম মেলবন্ধনে। তিনি সেই সঙ্ঘনেতা যিনি বলতে পারতেন, ''নির্বিকল্প সমাধির পর ধর্মজীবন শুরু হয়।''

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর থেকে স্বামীজীর পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কিছু-কম এগারো বছর সময়কালটি রাজা মহারাজ গভীর সাধনভজনে অতিবাহিত করেছেন। স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে ফিরে ১ মে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে কলকাতা কেন্দ্রের কার্যভার দিলেন—বস্তুত, সেই সময় থেকেই মহারাজের কর্মজীবনের সূত্রপাত এবং জীবনের বাকি পঁচিশটি বছর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-অতিরিক্ত তাঁর সাধনজীবন এবং তথাকথিত সেই কর্মজীবনের কোনও পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। 'তথাকথিত' বলার কারণ, রামকৃষ্ণ ভাবমার্গের একজন সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে প্রচলিত কর্মজীবন ও সাধনজীবনের মধ্যে প্রকৃত কোনও পার্থক্য থাকে না, জীবনের সমগ্রটাই তাঁদের অধ্যাত্মজীবন।

স্বামীজীর স্মরণে ছিল, ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ও একটা রাজ্য চালাতে পারে।'' ১৯০১ সালের শুরুতে তিনি ট্রাস্ট ডীড সম্পাদন করে 'রামকৃষ্ণ মঠ'-এর পরিচালন-ভার তাঁর এগারোজন সন্ন্যাসী গুরুভাইকে নিয়ে গড়া একটি ট্রাস্টিবোর্ড-কে সমর্পণ করে দিলেন। নিজে 'সাধারণ সভাপতি'র পদ ত্যাগ করে রাজা মহারাজকে সেই পদে অভিষিক্ত করলেন। নিজে কোনও পদেই আর থাকলেন না। গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, ''বস্তুতঃ ইঁহারা (অর্থাৎ ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যরা) প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বরূপ অবগত ছিলেন; অধিকন্তু স্বামীজীর ইহা অধিক জানা ছিল যে, বিশাল জগতে নব অনুপ্রেরণা জাগাইবার দায়িত্ব যিনি বহন করিয়াছেন, তিনি দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না।''

বস্তুত, এর তিন বছর আগেই বেলুড়ের স্থায়ী জমি কেনার পরেই স্বামীজী মঠের সমস্ত কার্যভার স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর দিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা স্বামী অশোকানন্দের স্মৃতিচারণ থেকে বলতে পারি, ''রামকৃষ্ণ মঠ ও (রামকৃষ্ণ) মিশনের প্রতিষ্ঠা

হওয়ায় ওই বছরগুলিতে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ওই কাজের জন্য অকল্পনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। ঠাকুরের মিশন বা জীবনব্রতকে স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার রূপায়ণের জন্য তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে অর্পণ করেছিলেন এবং অতি শীঘ্রই এই সংক্রান্ত সমস্ত কর্মোদ্যোগের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন।''

সেইসময় মঠ অবস্থিত ছিল তার তৃতীয় ভাড়া বাড়ি নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। বেলুড়ের জমিকে স্থায়ী মঠে রূপান্তরিত করার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যই প্রধানত মঠ ওই বাগানবাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই কাজ করতে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কী পরিশ্রম করেছিলেন, তা অশোকানন্দজী তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন। তিনি এই কথাগুলি সরাসরি শুনেছেন স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাইদের কাছে। এই সময় রাজা মহারাজ প্রায় ঘুমোতেনই না। নতুন জমিতে গঙ্গার ধারে পোস্তা বাঁধাতে হবে। কখনও কখনও মাঝরাতে কাজ শুরু হত; কারণ নদীর জলস্তর স্বাভাবিক সময়ে যা থাকে, তার অনেক নিচ থেকে পাড় বাঁধিয়ে আনতে হচ্ছিল। তাই ভাঁটার সময় ছাড়া শ্রমিকরা কাজ করতে পারত না। দিনরাতের যে-সময়ই ভাঁটা আসুক—স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং তাঁদের ইঞ্জিনিয়ার গুরুভাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে উপস্থিত থাকতেই হত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ শুরু করার জন্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনার পর থেকে স্বামীজীর স্থূলশরীর থাকাকালীন প্রথম পাঁচ বছর আরও কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্রহ্মানন্দজী করেছেন, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণই তাঁর স্বভাববিরোধী। তবুও তিনি সেগুলি প্রাণপণ যত্নে করেছেন, স্বামীজীর পরিকল্পিত সঙ্ঘের রূপায়ণে স্বামীজীকে সাহায্য করার জন্য। অশোকানন্দজী লিখেছেন, তাঁর সবচেয়ে স্বভাববিরোধী যে-কাজটি মহারাজ এই সময় করেছিলেন, ''সেটি হল বেলুড় মিউনিসিপ্যালিটির (আসলে বালি মিউনিসি-প্যালিটির) সঙ্গে একটি মামলা লড়া। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বেলুড় মঠের জমিটিকে একটি বাগানবাড়ি মনে করল—মঠ নয়। তার ফলে ট্যাক্স ধার্য করা হল। মামলাটির নিষ্পত্তি শেষ পর্যন্ত মঠের অনুকূলে হলেও, মামলাটি এক বছর ধরে চলেছিল এবং কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়ে মামলাটি লড়তে হয়েছিল।... স্বামী ব্রহ্মানন্দের মাপের একজন অতিকায় আধ্যাত্মিক পুরুষকে গৃহ নির্মাণ, মোকদ্দমা লড়া, হিসাবরক্ষা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকতে হবে, একথা কোনও মতেই ভাবা যায় না। কিন্তু স্বামীজীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য এ-সব কিছুই তিনি করেছিলেন।''

তিনি জানতেন স্বামীজীর বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ যদি বাস্তবে রূপায়িত হয়, তাহলে সন্ন্যাসের যুগ যুগ প্রচলিত ধারণায় একটা আমূল পরিবর্তন আসবে এবং তার ফলে সন্ন্যাস-আশ্রম এবং মানবসমাজ উভয়েই উপকৃত হবে। সেইজন্যই তিনি বিনা দ্বিধায় নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভাললাগা বা না লাগা—সব স্বামীজীর জন্য সমর্পণ করেছিলেন পরম তৃপ্তিতে। পরবর্তী কালে তাঁর স্বাধীন কর্মশক্তি দেখে যাঁরা বিস্মিত হয়েছেন, তাঁরা ততোধিক বিস্মিত হয়েছেন স্বামীজীর কাছে তাঁর এই সময়কার স্বেচ্ছাবৃত আত্মবিলয়ের ছবি স্মরণ করে। আবার আমরা উদ্ধৃত করব অশোকানন্দজীর স্মৃতিচারণ থেকে : ''যতদিন স্বামীজী স্থূলশরীরে ছিলেন, তিনি (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) স্বামীজীর অনুমোদন ছাড়া কিছু করতেন না। তিনি কখনও তাঁর সঙ্গে তর্ক করতেন না বা তাঁর বিরোধিতা করতেন না। স্বামীজীর কর্মপদ্ধতি বা ভাবাদর্শের প্রতি কোনও আপত্তি কখনও তো তিনি প্রকাশ করতেনই না; পক্ষান্তরে সেগুলির সঙ্গে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে নিয়েছিলেন। একমুহূর্তের জন্য তিনি কখনো নিজেকে স্বামীজী থেকে পৃথক করেননি এবং স্বামীজী জানতেন,

এমনও যদি কখনো হয় যে, অন্য সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, তখনও স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর পাশে থাকবেন, স্বামীজীর প্রতি নিজের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্যটি নিয়ে।" এই নির্বিচার আনুগত্যের বিষয়টি আলোচনা করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, শ্রীশ্রীমা তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন 'মহাসাগর'। এই মহাসাগর-সদৃশ আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের অন্য সব অলৌকিকতার মতো এই বিবেকানন্দ-প্রাণতাও অবশ্যই অলৌকিক। অশোকানন্দজী পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : ''and on that faith and loyalty of his, stability of the Ramakrishna Order was based."—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্থায়িত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দের ওই বিশ্বাস ও আনুগত্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। অশোকানন্দজী আরও বলেছেন : ''Swami Brahmananda, who had taken the responsibility of seeing that the Order grew as Swami Vivekananda wanted it to grow, never introduced any ideas different from those given by Swami Vivekananda."—স্বামীজীর ভাবের অতিরিক্ত একটি ভাবও তিনি এই সঙ্ঘের ভাবাদর্শের মধ্যে যোগ করেননি। পক্ষান্তরে, কেউ কখনও যদি স্বামীজীর ভাবের বিরোধিতা করেছে—অশোকানন্দজী বলেছেন—তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে বলতেন, ''এটা স্বামীজীর মঠ। যদি তুমি এখানে স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে চলতে না পারো, তবে চলে যাও মঠ ছেড়ে।" বারবার তিনি সাধুদের স্মরণ করিয়ে দিতেন : ''স্বামীজী তাঁর জীবনটাই দিয়ে দিলেন, এই সঙ্ঘ তৈরি করে তোমাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সবরকম ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। তোমরা একটু উপলব্ধি করার চেষ্টা কর যে, তাঁর কী অসীম ভালবাসা ছিল তোমাদের জন্য।"

তাহলে কি স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজী যতদিন মর্ত্যদেহে ছিলেন, কোনও ব্যাপারে কোনও মত প্রকাশ করেননি? করেছেন, হয়তো বা কয়েকবার বা অনেকবারও করেছেন। কিন্তু সে করেছেন স্বামীজীর অনুরোধে। কারণ, স্বামীজীই সর্বাপেক্ষা বুঝতেন ব্রহ্মানন্দের মর্ম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত তাঁর রাজবুদ্ধির মর্ম। দেহত্যাগের পাঁচমাস আগে (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২) নিবেদিতাকে একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন : 'I recommend you none—not one—except Brahmananda. That old man's judgements never failed.'—বৃদ্ধ মানুষটি বলতে স্পষ্টতই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিয়েছেন এবং নিবেদিতাকে বলতে চেয়েছেন : শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে যে-উচ্চ প্রশস্তি সর্বদা করেছেন তার ভিত্তিতেই তিনি তাঁর অবর্তমানে সর্বদা ব্রহ্মানন্দের পরামর্শ নেওয়ার সুপারিশ করছেন—কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও ভুল বলেননি বা মানুষ চিনতে তাঁর কখনও ভুল হয়নি। সবশেষে, স্বামীজী জোর দিয়ে বলছেন, 'with this my con-

science is clear.'—তোমাকে যে আমি বলছি ব্রহ্মানন্দের উপরই সবক্ষেত্রে নির্ভর করতে—সে-ব্যাপারে আমার বিবেক সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

সেইজন্য বহুক্ষেত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্পষ্ট মত বুঝে নিয়ে স্বামীজী সেই অনুযায়ী নিজের পদক্ষেপ পরিবর্তন করেছেন। তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের একটি সভা ডাকা হয়েছে বলরাম মন্দিরে। সালটি সম্ভবত ছিল ১৮৯৭। সদ্য প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক ব্যাপার নিয়ে কিছু আলোচনা হবে। এই অ্যাসোসিয়েশনের সবাই কীভাবে চলবে, তার একটা বিশদ বিধি-নিয়ম স্বামীজী একটা কাগজে তৈরি করে নিয়ে এসেছিলেন। সবাইকে স্বামীজী কাগজটি পড়তে দিলেন। সবাই মনোযোগ সহকারে পড়লেন, মন্তব্য করলেন, কেউ কেউ কিছু পরিবর্তনও সুপারিশ করলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই সেটি অনুমোদন করলেন। শুধু রাজা মহারাজ কিছু বললেন না। স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, ''কি হল রাজা? তুমি কিছু বলছ না যে? তোমার কি এটা পছন্দ হচ্ছে না?'' রাজা মহারাজ বললেন, ''না, নরেন, এত নিয়ম-কানুন আমার পছন্দ হচ্ছে না।'' স্বামীজী আর একটিও কথা না বলে খসড়া কাগজটি ছিঁড়ে ফেললেন।

একই সঙ্গে আর একটি ভিন্ন চিত্র এখানে উপস্থিত করা যায়। একদিন সকালে রাজা মহারাজজীর ঘরে স্বামীজী প্রণীত মঠের নিয়মাবলি পড়া হচ্ছে। পূজনীয় মহারাজ তাঁর ছোট খাটটিতে ধ্যানস্থ হয়ে বসে শুনছেন। পাঠ শেষ হলে মহারাজ বললেন, ''এসব কথা স্বামীজী এ দেহে থেকে বলেননি, খুব উঁচু স্তরে মনকে তুলে তারপর বলেছেন এবং তারকদা* লিখেছেন। এসব কথা কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেননি। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য, তাঁর ভাব প্রচারের জন্য বলেছেন। ঠাকুরের কথায় ও সেবায় সকলের সমান অধিকার—তা সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, ধনী বা দরিদ্র হোক, উচ্চ বা নীচ বংশের হোক—তাঁর কথা ও সেবা যে গ্রহণ করবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। তোমরা জীবনে এইসব সরল বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ কর, আচরণ কর, আর একধার থেকে ছড়াতে থাক, দেখবে কলির প্রতাপ নাশ হয়ে সত্যযুগের আবির্ভাব হবে।''

আর একবার স্বামী ধীরানন্দ রাজা মহারাজকে অনুরোধ করলেন নতুন সন্ন্যাসীদের জন্য কিছু নিয়ম করতে। তার উত্তরে রাজা মহারাজ বলেছিলেন, ''স্বামীজী তো আমাদের জন্য নিয়মাবলী তৈরি করে দিয়ে গেছেন। আমাদের আর তার সঙ্গে নতুন কোন নিয়ম যোগ করার দরকার নেই। আরও ভালবাসা যোগ কর। আরও ভক্তিলাভ কর আর অন্যকেও সাহায্য কর যাতে তারা ঈশ্বরের পথে এগুতে পারে।'' স্বামী অভেদানন্দজী বলেছেন, ''ভালবাসাই ছিল তাঁর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি ভালবাসা ছাড়া আর কোন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেননি। তিনি সকলকে শাসন করে গেছেন কেবল সেই ভালবাসার দ্বারাই।'' স্বামী সারদানন্দজীও ঠিক সেই কথাই বলেছেন। প্রভবানন্দজী বলেছেন, মহারাজের ভালবাসার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সকলেই মনে

* নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি ও আলমবাজার মঠে স্বামীজী মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্য ১৪০ টি নিয়ম মুখে মুখে বলেছিলেন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে মহাপুরুষজী এবং আলমবাজার মঠে স্বামী শুদ্ধানন্দ নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

করত মহারাজ বুঝি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।

এই ভালবাসার উৎস এক সমুচ্চ আধ্যাত্মিকতা যার প্রকৃতি ও গভীরতা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু তা যে আমাদের বোধসীমার অনেক বাইরে, তা বোঝা যেত তাঁর কথায় ও আচরণে। একবার শরৎ মহারাজ একটি জরুরি কাগজ মহারাজের কাছে রেখে গেছেন, স্বাক্ষর করার জন্য। মহারাজ সাত-আট দিন ধরে সেই কাগজটিতে সই করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কারণ নিজের নামের বানানটা মনে করতে পারছেন না। নাম-রূপের জগতের বাইরেই ছিল তাঁর মনের স্বাভাবিক গতি। হাসি ঠাট্টা, ছিপ হাতে মাছ ধরতে বসা—এগুলি লোককল্যাণার্থ ওই সমাধিমুখী মনকে সঙ্ঘমুখী, মানবমুখী ও জগৎমুখী করে রাখার কৌশল। তাই তাঁর ভালবাসা যেমন অলৌকিক, সঙ্ঘ পরিচালনাও অনেক সময় অলৌকিক বলে মনে হত। কাশীর দুটি আশ্রমের কয়েকজন অপরিণতমনস্ক সাধুর মধ্যে দীর্ঘকাল মনোমালিন্য চলছিল। সারদানন্দজী এবং তুরীয়ানন্দজীর চেষ্টায় সাময়িক ফল হলেও, কিছুদিন পর তাঁদের মনোমালিন্য আবার ফিরে এল। এরপর রাজা মহারাজ সেখানে এলেন। তিনি কাউকে কিছু বললেন না, বকলেন না বা কাউকে ডেকে কোনও তদন্তও করলেন না। শুধু দুই আশ্রমের সাধুদের নিয়ে একসঙ্গে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা জপধ্যান, ভজন ও সৎপ্রসঙ্গ করতে শুরু করলেন। তাঁদের মনগুলোকে রাজা মহারাজ এত উচ্চস্তরে তুলে নিয়ে গেলেন যে, তাঁরা ভুলেই গেলেন যে তাঁদের মধ্যে কোনও তিক্ততা আছে। দুই আশ্রমে শান্তি ফিরে এল। স্বামী সারদানন্দজী চমৎকৃত হয়ে বললেন, ''সাধু না হয়ে তোমার রাজা হওয়া উচিত ছিল। আমি আর হরি মহারাজ দুজনের মিলিত বুদ্ধিতেও যেখানে কূল দেখতে পাচ্ছিলুম না, কত সহজে তার কিনারা করে দিলে।''

মহারাজ খুব কমই ট্রাস্টিদের মিটিংগুলিতে উপস্থিত থাকতেন। বেলুড় মঠে উপস্থিত থাকলেও তিনি কোনও মিটিং-এ যোগ দিতে আপত্তি করতেন। একবার স্বামীজীর এক শিষ্য, যিনি নিজেও ট্রাস্টি, এ-ব্যাপারে মহারাজকে প্রশ্ন করলে মহারাজ বলেছিলেন, ''দেখ, গোটা জগতটা আমার কাছে ছায়ার মতো মনে হয়। আমার পক্ষে মিটিং-এ যোগ দেওয়া আর এতসব খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখা খুব কষ্টকর।'' কিন্তু তা সত্ত্বেও, স্বামী অশোকানন্দ লিখেছেন, ''তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন সঙ্ঘের কোথায় কি হচ্ছে সে-বিষয়ে। কিভাবে তিনি জানতে পারতেন কোথায় কি হচ্ছে, কেউ বুঝে উঠতে পারত না, কিন্তু তিনি সত্যিই জানতে পারতেন। এবং কখনো কখনো সেটা অন্যের পক্ষে সত্যিই খুব অস্বস্তিকর হত। কেউ হয়ত তক্ষুণি এসেছে তাঁর কাছে অন্য কোনও কেন্দ্র থেকে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, 'সেই গরুটা কেমন আছে? আর তার বাছুরটা? বাগানে ভাল সব্জি হয়েছে তো? আর ফলের বাগানটা? সেটা কেমন চলছে? এবার কত আম হয়েছে সেখানে?'... প্রতিটা জিনিস তিনি জানতেন, সবকিছুর ওপর লক্ষ রাখতেন—শুধু বাইরের কাজের খুঁটিনাটি নয়, সাধুদের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধেও।''

মহারাজ সাধুদের কাজ আর উপাসনা একসঙ্গে করতে বলতেন। তিনি ''তাঁর শিক্ষায় সহজযোগ বা সহজে ঈশ্বরের কৃপালাভের উপায়ের ওপরে খুবই জোর দিতেন। সেই সহজ উপায়টি হল, সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ মনন''। জপধ্যান সম্বন্ধে বলতেন, ''জপ কর, ভগবানের নাম কর। যাই কর না কেন, ঈশ্বরের নাম যেন সারাক্ষণ অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মতো সবসময় চলতে থাকে।'' আবার বলতেন, ''কর্মই উপাসনা। কর্মই উপাসনা।'' কিন্তু কর্মকে উপাসনা করার জন্য কর্ম ও উপাসনা

একযোগে করে যাওয়ার উপদেশই তিনি দিতেন। বাসুদেবানন্দজীকে একদিন তিনি বলেছিলেন, সাধু-ব্রহ্মচারীদের কী মনোভাব নিয়ে কাজ ও সেবা করতে হবে : ''যাদের spirit of service (সেবার ভাব) থাকবে, তারা কাজকে ভয় করবে কেন? এখানকার কাজ duty, না service of love? স্বামীজীর হুকুম তামিল করা soldier-এর মতো; শিবজ্ঞানে জীবসেবা।'' অর্থাৎ এটিই এখানকার ভাব—প্রেমের সঙ্গে সেবা, ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবা এবং সৈনিকের মতো অকুতোভয়ে স্বামীজীর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। তারপরে তিনি বলেন, ''স্বামীজী বলেছেন, work is worship, আমি কিন্তু আর একটু অন্যরকম করে বলি, work and worship—কাজের সঙ্গে বিচার ও ধ্যান ভজন না থাকলে ঠিক ঠিক work is worship হয় না।'' যতীশ্বরানন্দজীকেও তিনি একই কথা বলেছিলেন। তরুণ যতীশ্বরানন্দজী বলেছিলেন, কাজের জন্য তিনি সাধন-ভজনের সময় পান না। মহারাজ একদম এটিকে মেনে নেননি। তিনি বলেছিলেন, ''কাজের জন্য সময় পাওয়া যায় না, এইরূপ মনে করা ভুল। মনের চঞ্চলতার জন্য ঐরূপ মনে হয়।'' এরপর মহারাজ খুব ভাবের সঙ্গে তাঁকে বলেন, 'work' এবং 'worship' একসঙ্গে করে মনকে তৈরি করতে হয়। তাঁকে তিনি বলেছিলেন, ''কর্ম ঠাকুর-স্বামীজীর—এই ভাব নিয়ে করলে কোনও বন্ধন তো হবেই না, অধিকন্তু তার through দিয়ে spiritual, moral, intellectual এবং physical সব রকম উন্নতি হবে।'' নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলে তিনি বলেন, ''আমরাও পাঁচ-ছ বছর ঘুরে ঘুরে তারপর কাজে লাগি। স্বামীজী আমাকে ডেকে বললেন, 'ওরে, ওতে কিছু নেই—কাজ কর'। আমরাও তখন সবরকম কাজ করেছি। কই তাতে তো কিছু খারাপ হয়েছে বলে বুঝতে পারিনি।'' তারপরে কীভাবে কর্মকে উপাসনা হিসাবে করতে হয় বলছেন : ''একটি জায়গায় ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ নিয়ে পড়ে থাকা সবচেয়ে ভাল।... ভুলও যদি হয়, না হয় দুচার জন্ম গেলই। কিন্তু তা হয় না। তাঁদের কৃপায় দেখিস হাউইয়ের মতো কোথায় উঠে যাবি!... যেটুকু করবি ষোলো-আনা মন দিয়ে করবি—ওই হল কাজের secret. স্বামীজীও আমাদের এই কথা বলতেন।... কাজ করবার সময় একবার তাঁদের প্রণাম করবি। আবার কাজ করতে করতে মাঝে interval পেলে তাঁদের স্মরণ-মনন করবি। কাজ শেষ করে আবার প্রণাম করবি। তাঁদের কথা, তাঁদের উপদেশ—এই সব চিন্তা করে দিন কাটাবি। মনে করিসনি যে, এই সব নি—এর কাজ। ভাববি ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ।''

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি কথামৃত প্রণেতা মাস্টারমশাইকে বলেছিলেন : ''ঠাকুর এবার এসে জীবলোক আর শিবলোকের মধ্যে একটা ব্রিজ তৈরি করে দিয়ে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে ভগবানের কাছে যাবার কত সুবিধা হয়েছে।''

স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'ইন্ডিয়ান রিভিউ'-এর মার্চ ১৯১০ সংখ্যায় 'Ramakrishna Mission : The Scope and Method of its Work' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে এই সংক্রান্ত তাঁর সিদ্ধান্তটি এই ভাষায় পরিবেশন করেছেন :

''রামকৃষ্ণ মিশন অতীত এবং বর্তমানের সকল ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তা এই কারণে যে, একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের অভ্যন্তরস্থ সমন্বয়কে আবিষ্কার করেছে, আবিষ্কার করেছে তাদের সাধারণ ভিত্তি এবং প্রতিটি ধর্মের বেঁচে থাকার আবশ্যিকতা—যেখানে অন্য প্রতিটি ধর্মীয় সংস্থা শুধু এটিই জোর দিয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে যে,

বাকি সব ধর্মগুলির তুলনায় তাদের ধর্মটিই একমাত্র অভ্রান্ত, নিখুঁত এবং শ্রেষ্ঠ।"

বিখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু দেখিয়েছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পক্ষে ব্রহ্মানন্দজীর এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব কী। তিনি লিখেছেন,

''রামকৃষ্ণ মিশন প্রয়োজন মনে করেছিল নিজের আদর্শগুলিকে পরিষ্কার করে উচ্চারণ করার। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেটিই উদ্দেশ্য ছিল (এই প্রবন্ধ লেখার পেছনে)। নতুন যুগের আচার্য হিসেবে বিবেকানন্দের বাণীগুলি সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ের উদ্দেশেই উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন যেহেতু সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠান, এটা প্রয়োজন হয়েছিল যে, এই সন্ন্যাসিসঙ্ঘ তার উদ্দেশ্যসমূহের কথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের এই প্রবন্ধ সেই উদ্দেশ্যটি সাধন করেছে। এটি ছিল কার্যত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ঘোষণাপত্র (manifesto)।"

স্বামী শিবানন্দ

মহাপুরুষ মহারাজজী বলতেন : শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-অনুযায়ী একে রূপ দিয়েছেন। মহাপুরুষজী শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজী কৃত এই সঙ্ঘের পরিপুষ্টিতে আমৃত্যু ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে সর্বাগ্রে গৃহত্যাগ করেছেন তিনিই। পূজ্যপাদ গম্ভীরানন্দজী যাকে বলেছেন 'প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ', সেই বরানগর মঠের তিনিই প্রথম স্থায়ী বাসিন্দা। ত্যাগ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, সেবা ও কর্মযোগ—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাব। বরানগর মঠে এই সবকটি ধারাতেই জীবনযাপন করতেন মহাপুরুষ মহারাজ। স্বভাবত অন্তর্মুখ ছিলেন। কৃচ্ছ্রতা, ত্যাগ তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল। আর নরেন্দ্রনাথ প্রমুখের সাহচর্যে ধর্মের বৌদ্ধিক চর্চাও তখন মঠের আকাশে বাতাসে। মহাপুরুষজীর বৈশিষ্ট্য ছিল : যদিও তিনি স্বভাবত তপস্যাপরায়ণ ছিলেন ও সাধন-ভজন নিয়ে থাকতেই ভালবাসতেন, তথাপি অন্যের প্রয়োজন হলে সাধনভজন ছেড়েই লেগে পড়তেন মঠের জলতোলা, কুটনো কোটা, শৌচাগার পরিষ্কার প্রভৃতি কাজে। আর সব কাজই তিনি করতেন অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে।

স্বামীজীর মতো মহাপুরুষজীও দীর্ঘকাল পরিব্রাজক জীবন যাপন করেছেন। স্বামীজী একবার তুরীয়ানন্দজীকে বলেছিলেন, ''তোমরা যেখানে যাবে সেখানেই একটা সেন্টার গড়ে উঠবে।" মহাপুরুষজী সম্পর্কে একথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। স্বামীজী যখন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যান, তার কয়েকমাস পরে অক্টোবরে তিনি দক্ষিণ-ভারতের বেশ কয়েকটি প্রধান শহর ও তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করেন। দক্ষিণভারত তখন বিবেকানন্দের জয়গানে মুখর। সেই বিবেকানন্দের একজন গুরুভ্রাতাকে পেয়ে সর্বত্র মানুষ আবেগে ও আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। মাদ্রাজ, কাঞ্চী, চিদাম্বরম, মাদুরাই, রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গম, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর প্রভৃতি যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবের বিশেষ জাগরণ হয়েছে। তাঁর সেই অনাড়ম্বর অথচ গভীর প্রভাবপূর্ণ প্রচারের সংবাদ পেয়ে স্বামীজী আমেরিকা থেকে লিখেছিলেন : ''তারকদা মাদ্রাজে অনেক কাজ করিয়াছেন; বড়ই আনন্দের কথা। মাদ্রাজের লোকেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে লিখিয়াছে।"

এর তিনবছর পর স্বামীজীর ভারতে ফিরে আসার সময় হল। মঠ তখন আলমবাজারে। গোটা দেশ স্বামীজীর জন্য উন্মুখ। মহাপুরুষ মহারাজ আর মঠে স্থির থাকতে পারলেন না। মাদুরাই গিয়ে প্রিয় গুরুভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজীর অভূতপূর্ব সংবর্ধনা প্রত্যক্ষ করতে করতে স্বামীজীর সঙ্গেই

কলকাতা ফিরলেন ১৮৯৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি।

কলকাতায় ফেরার কয়েকদিন পরেই স্বামীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিং চলে গেলেন, আর মহাপুরুষজী আলমোড়া চললেন তপস্যার জন্য। তিনি আলমোড়া যাচ্ছেন শুনে স্বামীজী বলেছিলেন, আলমোড়ায় একটা আশ্রম করতে। মহাপুরুষজী সেটি করেছিলেন, তবে স্বামীজীর দেহত্যাগের একযুগ পরে, ১৯১৪ সালে।

কিছুদিন পর স্বামীজীও এলেন আলমোড়ায়। মহাপুরুষজীকে সিংহলে পাঠিয়ে দিলেন বেদান্ত প্রচার করতে। সেখানে সাত-আট মাস বেদান্ত প্রচার করে কলম্বোয় একটি বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন করে মঠে ফিরে এলেন।

মহাপুরুষজী স্বভাবতই অন্তর্মুখ এবং তপস্যা-পরায়ণ হলেও স্বামীজী তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় জানতেন। তাই বারবার স্বামীজী তাঁর ধ্যানশক্তিকে সেবা ও প্রচারকার্যে ব্যবহার করেছেন। মহাপুরুষ মহারাজও তাঁর চেয়ে প্রায় দশ বছরের কনিষ্ঠ সঙ্ঘনেতাকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনই শ্রদ্ধা করতেন সঙ্ঘের আদর্শ 'আত্মমুক্তি ও জগৎকল্যাণ'কে। তাই স্বামীজী তাঁকে যখন যে-কাজে নিয়োগ করেছেন, তখনই তিনি সেই দায়িত্ব মনপ্রাণ ঢেলে পালন করেছেন। এইভাবেই তিনি কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে, নিবেদিতার নেতৃত্বে প্লেগ সেবা করেছেন এবং প্লেগের পরেই স্বামীজীর নির্দেশে দার্জিলিঙে গিয়ে পাহাড়-ধ্বসে -ক্ষতিগ্রস্ত-হওয়া মানুষের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছেন।

ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যুর পর স্বামীজী যখন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে মায়াবতী যান, মহাপুরুষজীও সঙ্গে গিয়েছিলেন। স্বামীজী পনেরো দিন থেকে চলে আসেন কিন্তু মহাপুরুষজীকে পিলিভিটে রেখে আসেন প্রচার ও অর্থসংগ্রহের জন্য। সঙ্ঘনেতার আদেশ শিরোধার্য করে মহাপুরুষজী তাই করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর শরীর ক্রমশ খারাপ হওয়ায়, তিনি কাশী যান বায়ু পরিবর্তনের জন্য। মহাপুরুষজী পিলিভিট থেকে কাশীতে নেমে এসে স্বামীজীর সেবা করতে থাকেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে বেলুড় মঠে চলে আসেন। কাশীতে ভিঙ্গার মহারাজা বেদান্তপ্রচারের জন্য স্বামীজীকে ৫০০ টাকা দিয়েছিলেন। স্বামীজী মহাপুরুষ মহারাজকে কাশীতে গিয়ে কাজ শুরু করতে বললেন। অসুস্থ স্বামীজীকে ফেলে তিনি যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু স্বামীজী জোর করায় জুনের শেষ সপ্তাহে তিনি কাশী গেলেন এবং ১৯০২ সালের ৪ জুলাই সেখানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করলেন। দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে পৌঁছনোই সর্ব সাধারণের জন্য সহজ রাস্তা, শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করে মানুষ সেটিই করবে—আশ্রমটি স্থাপনার সেটিই উদ্দেশ্য ও নামকরণের মধ্যে সেই ভাবটিই পরিস্ফুট।

পরদিনই তিনি স্বামীজীর দেহত্যাগের মর্মন্তুদ সংবাদ পেলেন। মন ভেঙে গেল। তবুও স্বামীজীর শেষ আদেশ শিরোধার্য করে কাশীতেই থেকে গেলেন। কাশীতে তখন দুটি আশ্রমের মাধ্যমে স্বামীজীর আদর্শে চারভাবে সেবাকাজ চলছিল—ধর্মদান, বিদ্যাদান, প্রাণদান ও অন্নদান। প্রতিটি কাজের পেছনে ছিল মহাপুরুষজীর উৎসাহ ও প্রেরণা। অদ্বৈতাশ্রম, সেবাশ্রম, অদ্বৈতাশ্রমের অবৈতনিক বিদ্যালয়—প্রতিটির জন্য তিনি পরামর্শ দিতেন এবং অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেন। তিনি পাঁচ বছর কাশীতে ছিলেন, ওই পাঁচ বছর একটা স্বর্ণযুগ। তিনি বেদান্ত হয়ে বেদান্ত প্রচার করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার করতেন। পরবর্তী কালে তিনি নিজে বলেছেন, ''আমাদের জীবনটা পড়তে পার? আমাদের জীবনই হচ্ছে উপনিষদ্।'' তাঁর সেই উপনিষদময় জীবনের প্রভাবে কাশীর সাধারণ মানুষ ও পণ্ডিতসমাজ মুগ্ধ

হয়ে গিয়েছিল। মাস্টারমশাই বলেছিলেন, ''শিবানন্দের সাধনায় কাশী সেবাশ্রম কেমন জেঁকে উঠেছে দেখছ তো?''

১৯০৭ সাল থেকে তিনি মঠে থাকতে শুরু করেন। তখন রাজা মহারাজ প্রেসিডেন্ট, সারদানন্দজী সম্পাদক আর মঠ-পরিচালনার দায়িত্ব স্বামী প্রেমানন্দজীর। বাবুরাম মহারাজ অনুপস্থিত থাকলে তিনিই তাঁর কাজকর্ম ও ঠাকুর পূজা করতেন। বাবুরাম মহারাজের শরীর ভেঙে পড়লে ১৯১৬ থেকে তিনি পুরোপুরি মঠ-পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এরপর থেকে জীবনের শেষ আঠারো বছর তিনি মঠেই ছিলেন। ঠাকুরের কাজ ছাড়া ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক স্পৃহায় আর কখনও মঠের বাইরে যাননি।

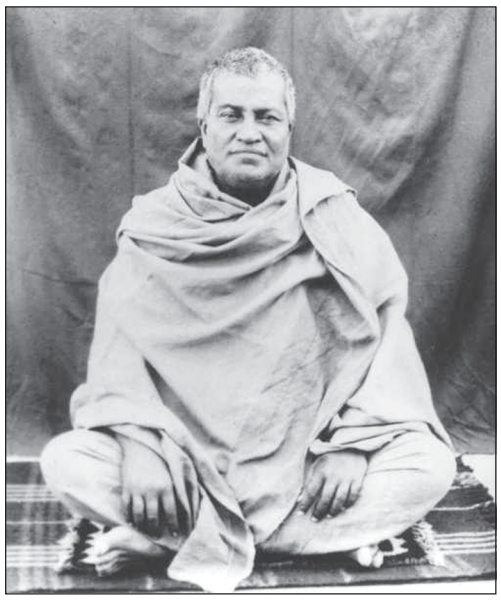

মা বলেছেন, ভালবাসায় ঠাকুরের সংসার গড়ে উঠেছে। মা এই উপদেশ দিয়েছিলেন জনৈক সন্ন্যাসী আশ্রম-অধ্যক্ষকে, আশ্রমের অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীর প্রতি তাঁর ব্যবহার কীরকম হওয়া উচিত, সেই প্রসঙ্গে। কাজেই, এখানে 'ঠাকুরের সংসার' বলতে বিশেষ করে এই সঙ্ঘকে বুঝতে হবে। ঠাকুরের পার্ষদরা প্রত্যেকে, এই মহাপুরুষজীও, ভালবাসা দিয়ে সঙ্ঘ চালাতেন, নিয়ম দিয়ে নয়। বাবুরাম মহারাজের কাছে একদল শিক্ষিত যুবক আসতেন, যাঁরা বাবুরাম মহারাজের দেহত্যাগের পর মঠে আসা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন পরে তাঁরা সন্ধ্যারতি দেখতে এসেছেন। ফিরে আসার সময় মহাপুরুষজী নিজে তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। আবেগভরে বললেন, ''তোমরা আজকাল আর মঠে আস না কেন? তা আমি বুঝতে পেরেছি, তোমরা কেন আসা বন্ধ করেছ। তোমরা আগে যেমন মঠে আসতে, এখনও তেমনি এস। জেনো, বাবুরাম মহারাজ তোমাদের যেমন ভালবাসতেন, আমিও তোমাদের তেমনি ভালবাসি।'' যুবকগণ অবাক হয়ে গেল। বুঝল, সেই ভালবাসা এখনও আছে। তারা আবার নিয়মিত মঠে আসতে শুরু করল। এদের অনেকেই পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

মহাপুরুষজী দীক্ষা দিতে শুরু করেন ঘটনাচক্রে। ১৯২২-র ফেব্রুয়ারি মাসে অভেদানন্দজীকে নিয়ে তিনি পূর্ববঙ্গে যান। ওই সময় বহু লোক তাঁকে ধরে দীক্ষার জন্য। নিরুপায় হয়ে সঙ্ঘাধ্যক্ষ রাজা মহারাজজীকে তিনি সব লিখে জানান। রাজা মহারাজজী খুশিমনে তাঁকে বলেন দীক্ষা দিতে। মহাপুরুষজীও তাঁর কৃপাভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিলেন পূর্ববঙ্গে। পরে বোঝা গেল শ্রীরামকৃষ্ণের নিগূঢ় ইচ্ছাতেই এটি হয়েছে। কারণ কয়েকমাস পরে (১০ এপ্রিল) স্বামী ব্রহ্মানন্দজী দেহত্যাগ করেন। মহাপুরুষ মহারাজজী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর অহংশূন্যতা। তিনি নিজেকে কখনও প্রেসিডেন্ট ভাবতেন না, বলতেন, ''আমি জানি যে মহারাজই প্রেসিডেন্ট। ভরত যেমন রামের পাদুকা সামনে রেখে রাজ্য চালাতেন,

আমিও তেমনি করছি। দীক্ষার সম্বন্ধেও বলতেন, ''আমি জানি যে আমি গুরু নই, ঠাকুরই গুরু।'' আমি শুধু মানুষফুল অঞ্জলি দিই ঠাকুরের পায়ে। বলি, তুমি দেখো, তুমি ভার নাও। আর দেখতেও পাই যে তিনি ভার নিচ্ছেন।'' শ্রীশ্রীমার মতন তিনিও দীক্ষিত শিষ্যশিষ্যাদের কল্যাণের জন্য ধ্যানজপ করতেন।

মা বলেছেন, ''ঠাকুর অদ্বৈত ছিলেন, তোমরাও অদ্বৈতী।'' অর্থাৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রত্যেকেরই চরম লক্ষ্য অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মহাপুরুষজীও অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এক-এক সময় তাঁর অদ্বৈত-অনুভূতি এত প্রবল হত যে ঘরে যে আসতেন বা আসত—সাধু-ব্রহ্মচারী এমনকী বিড়াল—তাকেই তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করতেন। কিন্তু তিনি ভক্তও ছিলেন। ঠাকুরের মতো জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ই ছিলেন তিনি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই শ্লোকটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল—''ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি।''—তোমার [অর্থাৎ মায়ের] যাঁরা শরণাগত হন, তাঁদের কোনও বিপদ হয় না, তাঁরাই আবার বহু লোককে আশ্রয় দেন। মহাপুরুষজীর কাছে জগজ্জননী, ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা এক ও অভেদ ছিলেন এবং এঁদেরই চির শরণাগত ছিলেন বলে এত মানুষকে তিনি আশ্রয় দিতে পেরেছেন! আর সকলের প্রতি তাঁর ছিল নির্বিচার প্রেম। কেউ আশীর্বাদ চাইলে বলতেন, ''আশীর্বাদ? Always flowing, always flowing.''

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আর একটি ভাব, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন; কারণ, বিন্দু নেই, সবই সেই ব্রহ্মসিন্ধু। Each soul is potentially divine. মহাপুরুষজী কারও দোষ দেখতে পারতেন না। সংশোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ, এমনকী তিরস্কারও তিনি কদাচিৎ করতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন এবং বলতেনও, ঠাকুরের আশ্রয়ে যারা এসে পড়েছে, সেই প্রতিটি সাধু-ব্রহ্মচারীই 'জাত সাপের বাচ্চা'।

ঠাকুর-স্বামীজীর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ব্রতে তাঁর ছিল পূর্ণ শ্রদ্ধা। নিজে যেমন তাতে অংশগ্রহণ করেছেন, সাধু-ব্রহ্মচারীদেরও তেমনি তাতে অংশগ্রহণ করতে বলতেন। ওড়িশায় দুর্ভিক্ষ সেবাকাজ শুরু হয়েছে। খবর এসেছে, তাড়াতাড়ি আরও সাধু চাই সেবাকাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য, অথচ মঠে লোকাভাব। সকলেরই নিত্য নিয়মিত কাজ আছে। মন্দিরের পূজারি জানালেন পূজার জন্য অন্য লোক পাওয়া গেলে, তিনি রিলিফে যেতে উৎসুক। মহাপুরুষ মহারাজ শুনে বলেন, ''বেশ তো, অন্য পূজারি না পাওয়া গেলে, আমিই ঠাকুরের পূজা করব, তাকে পাঠিয়ে দাও।'' মনে রাখতে হবে, সেই সময় তিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মহাপুরুষজীকে পূজা করতে হয়নি। কিন্তু তাঁর উৎসাহ সবাইকে খুব প্রেরণা দিয়েছিল। আর একবার লাহোরে প্লেগ। কয়েকজন সাধু ত্রাণকার্যে যাত্রা করছেন মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ নিয়ে। মহাপুরুষজী খুব উৎসাহ দিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন তাঁদের। তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই তিনি ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন : তিনি যেন সেবারত সাধুদের সুস্থ রাখেন মহামারির হাত থেকে। আর একবার একজন সাধু কিছুদিন রিলিফ করে এসে মহাপুরুষ মহারাজকে জানালেন, তিনি কিছুদিন নির্জনে তপস্যা করতে চান। মহাপুরুষজী খুব উৎসাহ সহকারে তাঁকে তপস্যা করার অনুমতি দিলেন এবং বললেন, তাঁর যে এই তপস্যা করার স্পৃহা জেগেছে, তা সেবাকর্মের অমোঘ ফলশ্রুতি।

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' ঘরানার প্রতি সাধুরা যেন শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান থাকেন, এ-বিষয়ে তিনি সদা সচেতন থাকতেন। তাই, সাধুরা উত্তরাখণ্ডে নির্জনবাস ও সাধন ভজন করতে চাইলে মহাপুরুষ মহারাজ 'প্রচুর

উৎসাহ ও প্রেরণা' দিলেও, ''তখনকার দিনে ভেকধারী সাধুসমাজে যে প্রাচীন ধরনের চালচলনের ও জীবনযাপন প্রণালীর সমধিক আদর ও চল ছিল, সাধুরা সেদিকেই ঝুঁকে পড়ত বলে মহাপুরুষজী আমাদের মঠের সাধুদের পক্ষে আশ্রমের বাইরে দীর্ঘকাল থাকাটা পছন্দ করতেন না।'' যাদের অনুমতি দিতেন, তাদেরও ওই বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে বলতেন, ''ভগবৎ-পরায়ণতা ও পরার্থপরতা—এ দুটি মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নিজের আরামে খাওয়া-থাকার চেষ্টা তো ইতরপ্রাণীও করে, মানুষ যদি ঐ সকল বিষয়ে লালায়িত হয়, তবে মানুষে আর পশুতে তফাত কি? বাবা, তোমাদের যেন এরূপ মতি না হয় ঠাকুরের কৃপায়।'' কথাগুলি বলেছেন স্বামী সারদেশানন্দজী।

তিনি সবসময় সতর্ক থাকতেন, ঠাকুর-স্বামীজী এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজা মহারাজ প্রমুখ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনচর্যার যে-সুনির্দিষ্ট ধারা ঠিক করে দিয়ে গেছেন, সেই অনন্য ধারাটিই যে সঙ্ঘের সাধুদের সন্ন্যাস ও ধর্মজীবনের জন্য সর্বার্থসাধক—এটি বুঝতে আমাদের সাধু-ব্রহ্মচারীদের যেন কখনও ভুল না হয়। একজন সাধু হৃষীকেশে কিছুদিন তপস্যা করে কাটিয়ে মঠে ফিরে অন্য সাধুদের কাছে হৃষীকেশের সাধুদের তিতিক্ষার খুব প্রশংসা করতেন, বলতেন—তাঁরা শীত-গ্রীষ্মে কৌপীনমাত্র পরে থাকেন, প্রবল গ্রীষ্মে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে পারেন আবার প্রবল শীতে গলাজলে ডুবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন ইত্যাদি। একদিন মহাপুরুষজী মঠবাড়ির উঠোনে আমগাছের তলায় বসে একজন ভক্তের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আর ওই সাধুটি বারান্দায় বসে কয়েকজন সাধুর কাছে ওই একই কথা বলছিলেন। ভক্তটি চলে গেলে মহাপুরুষ মহারাজ নিজে ওই সাধুটির কাছে এলেন এবং তাঁকে বললেন, ''কীসব তিতিক্ষার কথা বলছ? তিতিক্ষা কাকে বলে জান? জলে ডুবে থাকলে বা সূর্যের দিকে থাকিয়ে থাকলে বা খালি কৌপীন পরে থাকলেই তিতিক্ষা হয় না, তাকে তিতিক্ষা বলে না। স্তুতি-নিন্দা, মান-অপমান বা সুখে-দুঃখে উদাসীন হয়ে একমাত্র ভগবানে মন নিবিষ্ট করে সাধন-ভজনে ডুবে থাকাকেই তিতিক্ষা বলে। আসল কথা হল শ্রীভগবানে মন রাখা; শুধু দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন তিতিক্ষা নয়।''

একজন সন্ন্যাসী নতুন সন্ন্যাসদীক্ষার পর মহাপুরুষজীকে বলেছিলেন : পরমহংস উপনিষদ ও নারায়ণ উপনিষদে সন্ন্যাসীর পক্ষে যেসব বিধি নির্দিষ্ট আছে, সেসব নিয়ম সঙ্ঘের কাজকর্মের মধ্যে থেকে কী করে মেনে চলা সম্ভব? মহাপুরুষজী স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, ওই সব নিয়ম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের জন্য নয়। এই সঙ্ঘের সাধুরা কর্মযোগী সন্ন্যাসী, তাদের জন্য স্বামীজী নতুন আদর্শ রেখে গেছেন। তা হল : সাধন-ভজন আর অনাসক্তভাবে সাধন-ভজনের অনুকূল কর্ম। আর মূল জিনিস হল কাম-কাঞ্চনত্যাগ—সেটিকে ধরে রাখতে হবে। আর পরমহংস উপনিষদ ও নারায়ণ উপনিষদে যেসব বিধি-নিয়ম আছে, সেগুলি জ্ঞানমার্গী সাধুদের জন্য, যাঁরা কোন কাজকর্ম করে না—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের ওই আদর্শ নয়।

মহাপুরুষ মহারাজ সঙ্ঘের কাজ ও সেবাব্রতকে খুবই গুরুত্ব দিলেও, রাজা মহারাজের মতো তিনিও জপধ্যানকেও সমগুরুত্ব দিতেন এবং জপধ্যান ছাড়া ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম ও সেবাব্রত সাধন করা সম্ভব নয়, এটি জোর দিয়ে বলতেন। এ-সংক্রান্ত তাঁর কয়েকটি নির্দেশ উদ্ধৃত করছি অপূর্বানন্দজীর 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' বই থেকে। একজন সাধুকে : ''যেখানেই থাক নিজের জপধ্যান কখনই ছাড়িবে না—সেটি করা চাই-ই চাই।'' অপর একজন

সাধুকর্মীকে : ''তোমার জপ-ধ্যানের সময়টা ঠিক রাখা উচিত—কারণ উহাই শক্তি।'' আর একজন সন্ন্যাসীকে : ''ধ্যানজপ বাদ দিয়ে ঠাকুর স্বামীজীর ideal অনুযায়ী কাজ can never be done. Work and Worship একসঙ্গে চালাতে হবে।'' যাকে বলেছিলেন, সেই সন্ন্যাসী লিখেছেন : ''can never be done এই কথা কয়টি এমন জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যেন পর্বত টলিয়া যায়।''

বেলুড় মঠের উপর তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। একে তিনি সমগ্র রামকৃষ্ণ মিশনের শুধুমাত্র প্রশাসনিক কেন্দ্র বলে মনে করতেন না—মনে করতেন সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রও। বলতেন, ''এ স্থান তো বৈকুণ্ঠ! স্বয়ং জগন্নাথ এখানে রয়েছেন জগতের কল্যাণের জন্য, আর স্বামীজীর মতো সিদ্ধ মহাপুরুষ এখানে ছিলেন।... আর ঠাকুরের পার্ষদরা সকলেই এখানে সূক্ষ্মদেহে আছেন।... কোথায় কোনও একজন সাধক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাতেই সেই স্থান তীর্থে পরিণত হয়েছে, আর এ যে মহাতীর্থ।'' তিনি মনে করতেন, ''বেলুড় মঠ থেকেই আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবাহিত হয়ে গোটা সঙ্ঘকে এবং সঙ্ঘের মধ্যে দিয়ে গোটা জগৎকে প্লাবিত করবে।''

স্বামীজী বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের পর থেকে সত্যযুগের সূচনা হয়েছে, সূচনা হয়েছে এক নবযুগের যা আগে কখনও হয়নি। মহাপুরুষজী মনে করতেন : সেই নবযুগ ত্বরান্বিত হয়ে আসছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তথা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলির দ্বারা।

স্বামীজী মহান দেশপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ মিশন সেইসময়কার স্বাধীনতা আন্দোলনরূপ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে না কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধায় তিনি বলেছিলেন, ''আমরা [অর্থাৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ] নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। [অর্থাৎ রাজনীতির সংস্রবে না থেকে আত্মমুক্তি ও জগৎকল্যাণের কাজ করে যাচ্ছি] আর ঐ আদর্শ রেখে গেছেন দূরদর্শী ঋষি স্বামীজী নিজে।''

তিনি নিজে এই সঙ্ঘের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন এবং এই সঙ্ঘেরই বা কী মহিমা তা তিনি একবার প্রকাশ করেছিলেন এই ভাষায় : ''সঙ্ঘের জন্যই এখনও ঠাকুর (আমাকে) রেখেছেন। সঙ্ঘকে পাকা করে দেবার জন্য। পাকা আছেই, তবে আরও দৃঢ় করে দেবার জন্য। এই সঙ্ঘ স্বামীজী করে গেছেন। যে এর বিরুদ্ধে যাবে—সে যেই হোক—তার মাথায় মুগুর পড়বে।'' সাধুদের তিনি বলতেন, ''পড়ে থাকো বাবা, যো সো করে পড়ে থাকো।... Loyalty to Sangha is loyalty to Thakur''—সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্যই ঠাকুরের প্রতি আনুগত্য।

এই সঙ্ঘের স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''অতীতে যেসব সঙ্ঘের পতন হয়েছে তার মূল কারণ ছিল সাধনভজন ও ত্যাগ-তপস্যাদির অভাব। ঠাকুরের এই সঙ্ঘেও যতদিন ত্যাগ বৈরাগ্য সমুজ্জ্বল থাকবে, সঙ্ঘের প্রত্যেক অঙ্গ যতদিন ভগবান লাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জেনে ভজন সাধন ও তপস্যাদিতে রত থাকবে, ততদিন কোনই ভয় নেই—সব ঠিক চলবে । তাছাড়া তোমরা যেসব কাজকর্ম করছ, সেসবই তো শ্রীভগবানের কাজ—তোমাদের নিজের জন্য তো আর কেউ কিছু করছ না? কাজ তো তোমাদের সাধনের অঙ্গ।'' ''স্বামীজী তাঁর দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে এই উঠোনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—যে স্রোত এসেছে তা অবাধে সাত-আট শত বৎসর চলবে, কেউ তার গতিরোধ করতে পারবে না।... এ যুগ-প্রয়োজন সাধনে যে সহায়ক হবে সে নিজে ধন্য হয়ে যাবে।''

পরবর্তী প্রজন্মের সাধুদের জন্য তাঁর প্রত্যাশা ও নির্দেশ : ''এবার তোমাদের পালা। ত্যাগ, তপস্যা

ও ভজন সাধন দ্বারা এ মঠের আধ্যাত্মিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এমন আদর্শ জীবন তৈরী করতে হবে যাতে লোকে তোমাদের সঙ্গ করে মনে করবে যে, সাক্ষাৎ ঠাকুর ও তাঁর পার্ষদদের সঙ্গ করছে।"

স্বামী প্রেমানন্দ

ঠাকুর তাঁকে রাধারানির অংশ বলে চিনেছিলেন। আবার তিনি যখন ঠাকুরের কাছে ভাবসমাধি লাভের জন্য খুব করে ধরেছিলেন, তখন জগদম্বার কাছে ঠাকুর উত্তর পেয়েছিলেন : ''বাবুরামের ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।" স্বামীজী বলেছেন : 'love is Vedanta' কারণ, অদ্বৈত বেদান্তের চরমে সবার সঙ্গে একত্ব অনুভব হয় এবং ভালবাসাও, আমরা যাদের ভালবাসি, তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্ম করে দেয়। তাই ভালবাসা বেদান্তস্বরূপ। স্বামী প্রেমানন্দের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত জ্ঞানের কথা শ্রীজগদম্বা শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে বলেছিলেন, তাঁর জীবনে আমরা তার বহিঃপ্রকাশ প্রেমপথেই দেখেছি; এবং সে-প্রেম আচণ্ডালে অপ্রতিহত থাকা নির্বিচার প্রেম। স্বামীজীর দেওয়া 'প্রেমানন্দ' নাম সার্থক হয়েছিল তাঁর জীবনে এবং প্রেমস্বরূপ হয়েই তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গড়ে ওঠার দিনগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দিষ্ট তাঁর ভূমিকাটি পালন করেছেন। তাঁর দেহত্যাগের পরে মাস্টারমশাই যে বলেছিলেন, ''ঠাকুরের প্রেমের দিকটা চলে গেল", সেটি যথার্থ।

স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে যে সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন, তাতে প্রেমানন্দজীর অংশগ্রহণের শুভারম্ভ ঠাকুরঘরের পূজক হিসেবে। বরানগর মঠ থেকে শুরু করে এগারো বছর ওই দায়িত্বটি পরম নিষ্ঠায় পালন করেছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী। স্বামীজী তাঁকে মাদ্রাজে আশ্রম স্থাপন করার জন্য পাঠিয়ে দিলে প্রেমানন্দজী সানন্দে মঠের ঠাকুরপূজার সেই দায়িত্বটি নিয়েছিলেন।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর সঙ্ঘ-পরিচালনার ভার স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর পড়ে। তখন থেকে প্রেমানন্দজী রাজা মহারাজজীর ডান-হাত হয়ে মঠের ঠাকুরপূজা থেকে গোসেবা পর্যন্ত সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে থাকেন। সেইসময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, নতুন ব্রহ্মচারীদের মনে স্বামীজী-প্রবর্তিত নবযুগের সন্ন্যাস-আদর্শটি গেঁথে দেওয়া। এই কাজটি প্রেমানন্দজী করতেন, যেটি বাড়িঘর তৈরি ও সঙ্ঘের বাহ্যিক বিস্তৃতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের জন্য যে-আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা তাঁর গুরুর কথায় : অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সবকিছু করা। স্বামীজী তাকেই বলেছেন 'প্র্যাকটিকাল বেদান্ত' বা 'ব্যাবহারিক বেদান্ত'। প্রেমানন্দজী নবীন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনে নিতেন, তাদের সঙ্গে নিয়ে একসাথে ঘাস কাটতেন, বাগানে কাজ করতেন, কুটনো কুটতেন, এবং কাজ করতে করতে তাদের মনে গেঁথে দিতেন যে, এই কাজগুলি সবই নানাভাবে ঠাকুরেরই পূজা।

কিন্তু প্রথম প্রথম তিনি স্বামীজীর কাজের ধারাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মনে হত : সেটি ঠাকুরের আদর্শ থেকে আলাদা। একদিন বেলুড় মঠে তিনি নিজেই অশেষানন্দজীকে সেকথা বলেছিলেন। এটি ১৯১৩ সালের কথা। প্রেমানন্দজী তাঁকে বলেন, ''এই চেয়ার-টেবিল-আসবাবপত্রগুলো দেখছ? স্বামীজী আমেরিকা থেকে ১৮৯৭ সালে ফিরে আমাদের কাছে এই জিনিসগুলি চেয়েছিলেন। আমরা সবাই তখন খুব একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমরা অন্য ধরন দেখেছিলাম কিনা। তিনি একটা সাদামাটা ঘরে থাকতেন—সেখানে কোনও আসবাবপত্র ছিল না, কিছুই ছিল না। দুটো খাট ছিল শুধু, সেখানেই

তিনি বসতেন, সেখানেই ঘুমোতেন। তিনি কখনও ভগবান ছাড়া আর কিছু বিষয়ে শুনতে চাইতেন না। ঈশ্বরময় পুরুষ। ভগবানের কথা বলতেন, ভগবানের গান গাইতেন, ভগবানের নাম করতে করতে সমাধিতে চলে যেতেন। তিনি আমাদের এমনই শিখিয়েছেন। তিনি কখনও এইসব সঙ্ঘ, হাসপাতাল, স্কুল, ম্যাগাজিন এসব ব্যাপারে আমাদের কিছু শেখাননি। সেইজন্য আমরা বলেছিলাম, 'স্বামীজী ঠাকুরের ধারা পালটে দিচ্ছেন, তিনি সম্পূর্ণ আলাদা কিছু শেখাচ্ছেন।' আমরা এর সঙ্গে (স্বামীজীর কাজের ধারার সঙ্গে) নিজেদের মেলাতে পারছিলাম না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যদি আমরা স্বামীজীর চোখ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে না তাকাই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব না ঠাকুর কি ছিলেন আর আমাদের দিয়ে তিনি কি করাতে চেয়েছিলেন।" এই বলতে বলতে তিনি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, ''এখন আমি স্বামীজীর শিষ্য। তোমরা যদি কখনও শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে চাও, স্বামীজীর রচনাবলী পড়। তাঁর সম্বন্ধে ভাব, তিনি আমাদের যা করতে বলেছেন কর। সেটাই একমাত্র পথ।" বহুবার তিনি প্রকাশ্য জনসভায় যেমন বলেছেন তেমনি নবীন সন্ন্যাসীদেরও বলেছেন এই কথা : ''যাও, এখন স্বামীজীর ধ্যান কর। প্রথমে তাঁর সত্তায় ভরপুর হয়ে ওঠো। তারপর তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝবার উপযুক্ত হয়ে উঠবে।" স্বামীজী এবং ঠাকুর এবং তাঁদের বাণী প্রেমানন্দজীর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর উদ্দীপনাময় পত্রগুলিতে শুধুই স্বামীজীর কথা। কখনও কখনও তিনি স্বামীজীর বাণীকে ঠাকুরের বাণী বলে উল্লেখ করেছেন জ্ঞাতসারেই—এতটাই তিনি ঠাকুরের প্রকাশ উপলব্ধি করতেন স্বামীজীর মধ্যে। কয়েকটি উদাহরণ : ''আমরা ঠাকুরের সংসারে শিখতে এসেছি এই—বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। নারায়ণবোধে জীবের সেবা কত্তে আমাদের জন্ম; এই আমাদের সাধন ভজন তপস্যা।" (পত্র ৫।২।১৭) ''এযুগের অবতার বলেছেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর! এ ভাব প্রত্যক্ষ কর, মানবজীবন ধন্য কর, স্বামীজীর কৃপায় তোমরা আদর্শ জীবন লাভ কর।" (৫।৬।১৬) ''শিবজ্ঞানে জীবসেবা কর—ইহাতেই ভক্তি, মুক্তিলাভ নিশ্চয় জানবে।" মালদায় একটি বক্তৃতায় সারাক্ষণ তিনি স্বামীজীর ঐ দরিদ্রনারায়ণ সেবার কথাই বলে গেলেন। তখনও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখে সংসারবাসী মানুষের সেবার উপদেশ শুনতে লোকে অভ্যস্ত হয়নি। শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বক্তৃতার শেষের দিকে বারবার বলতে থাকেন : ''আমরা একটু প্রেমভক্তির কথা শুনতে এসেছিলাম।" বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রেমানন্দজী শেষকালে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, ''কে শুনবে, কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? প্রেমভক্তির কথা শুনবার অধিকারী কে আছে এখানে?" তারপর একটি গল্প বললেন যাতে একজন ফেরিওয়ালা প্রেম ফেরি করে চলেছেন উচ্চস্বরে। প্রেম কিনতে দলে দলে লোক ছুটে আসছে, কিন্তু প্রেমের দাম হিসেবে তিনি চাইছেন কাঁচা মাথা। তাই তাঁর প্রেম আর বিক্রি হল না। গল্পটি বলে প্রেমানন্দজী জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন : ''কেউ পারবেন আপনারা মাথা দিতে? সহজ নয় প্রেমভক্তি! এযুগে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন তাই ধর্ম—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।"

পরে যিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে একজন বেদান্তজ্ঞ সন্ন্যাসীরূপে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই বাসুদেবানন্দজী একসময় তরুণ বয়সে বাঁকুড়ায় একটি দুর্ভিক্ষসেবায় রত ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজী তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন : ''কাউকে অসুস্থ

দেখলেই সেবা করবে। বহু জন্মের ভাগ্যে স্বামীজীর অপূর্ব দান সেবাধর্ম প্রাপ্ত হয়ে যদি বেদান্ত পড়া ও জীবসেবার মূল্য তোমার কাছে এক বলে বোধ না হয়, তাহলে বুঝবে বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত মহাপুরুষগণ থেকে তুমি দূরে দাঁড়িয়ে।”

সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে কীভাবে তিনি কাজের উচ্চ ভাব সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করিয়ে দিতেন তার একটি দৃষ্টান্ত : বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণ চোরকাঁটা ও আগাছায় ভরে গেছে। কয়েকজন নবাগত ব্রহ্মচারীকে আগাছা উপড়ে ফেলার দায়িত্ব দিয়ে তিনি অন্য কাজে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখেন প্রাঙ্গণের অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি খুব খুশি। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝলেন আগাছা উপড়ে ফেলা হয়নি, ছুরি দিয়ে উপর থেকে কেটে প্রাঙ্গণকে সহজে পরিষ্কার করা হয়েছে। দুদিন বাদেই তো সেগুলো আবার বেড়ে উঠবে! তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘‘ছুরি দিয়ে কাটলে যে!” ব্রহ্মচারীরা বলল, ‘‘শিকড় ওঠানো বড়ই হাঙ্গামা, তাই ছুরি দিয়ে কাটছি।” প্রেমানন্দজী অমনি গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, ‘‘হাঙ্গামা! আমি ভেবেছিলাম ঠাকুরের কাজ আনন্দে করছ। হাঙ্গামা যদি মনে হয়, সে কাজ আমি করতে বলিনি। আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ছুরি দিয়ে কাটা বড় অন্যায়। কারণ তাতে আগাছার শিকড়গুলো আর সহজে ওঠানো যাবে না।” তারপর একটু নীরব থেকে বলে যেতে লাগলেন, ‘‘দেখ বাবা, একটা কথা বলছি, ভবিষ্যতে তোমরা অনেক বড় বড় কাজ করবে। কিন্তু ফাঁকি দেবার বদ অভ্যাসটুকু যদি একবার জীবনের স্তরে স্তরে ঢুকে পড়ে, তাহলে রক্ষা নেই। সামান্য উঠানের ঘাস পরিষ্কার করার কথা আমি বলছি না, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটিতে এই ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাসটুকু দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করলে জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। সুতরাং এটা কোর না—এই আমার অনুরোধ।”

মঠে সাধু-ব্রহ্মচারীদের যেমন তিনি কাজ শেখাতেন, প্রয়োজনমতো ভর্ৎসনা করতেন, তেমনি তিনি ভালবেসে তাদের সব সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে চাইতেন। তাদের সকলকে নিয়ে অবিরাম ঠাকুর-স্বামীজীর কথা বলতেন ও তাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। স্বামীজী বলে গেছেন, বিদ্যাচর্চার অভাবে সঙ্ঘের অবনতি হয়। প্রেমানন্দজী এদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। শাস্ত্রচর্চা না করলে তিনি বিশেষ বিরক্ত হতেন। বলতেন, ‘‘পড়াশোনা কিছু হচ্ছে, না কেবল কুলিগিরি? মূল শাস্ত্রটাস্ত্র কিছু পড়?” এক ব্রহ্মচারীর একটু ইংরেজি জ্ঞান দরকার। একটি ইংরেজি বইয়ের নাম করে তিনি তাঁকে বললেন, ‘‘ওখানি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তিন মাসের মধ্যে শেষ করা চাই—নইলে অফিস থেকে চারটি পয়সা নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে যাবে।” (অর্থাৎ নৌকো করে মঠ ত্যাগ করবে।) আর তার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন : ‘‘এটা বাবাজীদের আখড়া নয়—স্বামীজী সেজন্য বেলুড় মঠ নির্মাণ করেননি।”

মহাপুরুষ মহারাজ লিখেছেন, ‘‘মঠের দৈনন্দিন

পরিচালনার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যেসকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন সেগুলি তিনি প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা করিতেন। মঠে শাস্ত্রপাঠ নিত্য হওয়া স্বামীজীর প্রাণের ইচ্ছা ছিল। ঐজন্য বাবুরাম মহারাজ যতকাল মঠে ছিলেন ঐ বিষয়টির প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।... ইংরেজী, দর্শনাদির চর্চাও যাহাতে মঠে নিয়মিতরূপে চলে তদ্বিষয়ে বাবুরাম মহারাজের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।" স্বামী প্রেমানন্দজীর উদ্যোগে মঠে সেইসময় একটি সংস্কৃত টোলও গড়ে উঠেছিল। সেটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন একজন বেদান্ততীর্থ উপাধিধারী পণ্ডিত। সেবাকার্যের ব্যাপারেও একটা সময়ে তিনি শুধুমাত্র অন্নদান ও শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর থেকেও বিদ্যাদানের প্রয়োজন বেশি অনুভব করেছেন এবং সাধু ও যুবকবৃন্দকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তেজোময় ভঙ্গিতে বারবার সেকাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর দু-একটি পত্রাংশ এখানে উপস্থিত করছি :

''বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষাবিস্তার, বিদ্যা ও জ্ঞান দান যত পার করে যাও। ইহা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণের ইচ্ছা ছিল।" (পত্র ২০।২।১৭) ''কেবল সেবাশ্রম আর সেবাশ্রম! ঐ এক হুজুক উঠেছে! কেন, নূতন কি কিছু করবার নাই? স্বামীজী শেষ দিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কাছে কেবল বিদ্যাপ্রসারের কথা বলেছিলেন। ইহাতে তোমাদের ও দেশের মহাকল্যাণ হবে, ইহা ধ্রুবসত্য, ইহা ধ্রুবসত্য।"

স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, ''স্বামী প্রেমানন্দকে কেন্দ্র করিয়াই তখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের মঠজীবন পরিচালিত হইত এবং উহার প্রভাব বেলুড় হইতে উৎসারিত হইয়া এখনও পরম্পরাক্রমে সঙ্ঘের স্তরে স্তরে শতধারে প্রবাহিত রহিয়াছে—এইরূপ বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহা সত্য বটে যে, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দাদি শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদবৃন্দের আদর্শও নবাগতদের জীবনে অনুপ্রেরণা জাগাইত এবং তাঁহাদের আচার এবং ভাবভঙ্গী নবপথে পদক্ষেপের রহস্য উদ্ঘাটিত করিত। কিন্তু মঠবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি চরণবিন্যাসের সহিত বিজড়িত থাকিত স্বামী প্রেমানন্দের নির্দেশ ও প্রেমময় আচরণ।"

মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন কীভাবে মঠ চালাতে হবে, কীভাবে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঠাকুরের ভাব প্রচার করতে হবে—স্বামীজী এগুলি বিশেষ করে প্রেমানন্দজীকেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। স্বামীজীর শিক্ষাগুণে তিনি স্বামীজীর বাণীর এক অগ্নিবর্ষী প্রচারক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কখনও কখনও কয়েক সহস্র লোকের জনসভায় তিনি ভাষণ দিয়েছেন। অগ্নিময়ী ভাষায় তিনি ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন আর সভাশুদ্ধ মানুষ এমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে যেন একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে। এই সংবাদ আমরা পাই স্বামী অশোকানন্দজীর সূত্রে।

প্রেমানন্দজী বলতেন, ''বক্তৃতা দিয়ে উপদেশ লিখে ঠাকুরের প্রচারের সময় এ নয়, এ হচ্ছে তাঁর ছাঁচে আদর্শ জীবন দেখানোর সময়।" (পত্র ১৫।৮।১৬) প্রেমানন্দজী বক্তৃতা দিয়েছেন, পত্র লিখেছেন, মানুষের সঙ্গে অনেক কথোপকথন করেছেন—কিন্তু সবকিছুর পেছনে তাঁর যে ঠাকুরের-ছাঁচে-ঢালা আদর্শ জীবনটি ছিল সেটির শক্তিতেই তিনি ঠাকুরের ভাবপ্রচারের এক বিরাট যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ''ভালবেসে জগৎ জয় কর। উহাই রামকৃষ্ণ মিশন।" প্রেমানন্দজী সেই রামকৃষ্ণ মিশনের উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে বিরাজ করতেন। মহাপুরুষজী বলেছেন, ''মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী এবং বাহির হইতে সমাগত ভক্তেরা সকলেই তাঁহার আদরযত্নে ও অমায়িক ব্যবহারে একবাক্যে বলিতেন যে, প্রেমানন্দ স্বামী যেন মঠের

মা।"

মিশনের স্থাপনা থেকে শুরু করে সঙ্ঘের প্রথম দু-দশকের জীবনে প্রেমানন্দজীর অনন্য ভূমিকাটি সার্থকরূপে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমায়ের এই উক্তিতে : ''মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি—সব আমার বাবুরামের রূপ ধরে মঠের গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত।" সেই আলোর অনুভবের অস্ফুট, বিহ্বল, হ্রস্ব-প্রকাশ আমরাও শুনেছি প্রত্যক্ষদর্শী পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজীর শ্রীমুখে : ''বাবুরাম মহারাজ! সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"

স্বামী সারদানন্দ

ঠাকুর তাঁর কোলে বসে দেখেছিলেন, কতটা ভার তিনি বইতে পারেন। পরবর্তী কালে সঙ্ঘের ভার, শ্রীমায়ের ভার, শ্রীমায়ের বিশাল, বিচিত্র পরিবারের ভার—সব ভার বহন করে আমাদের চিরপ্রণম্য হয়ে রয়েছেন সারদানন্দজী। ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে ও শশী মহারাজকে তিনি যিশুখ্রিস্টের দলে দেখেছিলেন। পাশ্চাত্যে যাওয়ার পথে তিনি রোমে নেমে সেন্ট পিটারের গির্জায় গিয়েছিলেন এবং সেন্ট পিটারের প্রতিমূর্তির সামনে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশ থেকে ফেরার পথেও তিনি রোমে এসেছিলেন এবং প্রাণের টানে একাধিকবার সেন্ট পিটারের মূর্তি দেখতে গিয়েছিলেন।

উদ্বোধনে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ একদিন তাঁকে বলেছিলেন যে, সেন্ট পিটারের সঙ্গে তাঁর বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সারদানন্দজী এর কোনও প্রতিবাদ না করে ঈষৎ হেসে শুধু বলেছিলেন, সেন্ট পিটারের মূর্তি দেখে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাই প্রচলিত বিশ্বাস যে, যিনি সেন্ট পিটার ছিলেন তিনিই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ।

যিশুখ্রিস্ট তাঁর প্রধান শিষ্য পিটারকে লক্ষ করে বলেছিলেন, ''Upon this rock I will build my church''—এই প্রস্তরখণ্ডের উপর ভিত্তি করে আমি আমার ধর্মসঙ্ঘ গড়ে তুলব। স্বর্গস্থ পিতা ও যিশুখ্রিস্টের প্রতি পিটারের ছিল অবিচল বিশ্বাস ও ভক্তি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অদম্য প্রাণশক্তি। এইসব মিলে সেন্ট পিটার খ্রিস্টধর্মের আদিপর্বে এক প্রবল প্রেরণারূপে বিরাজ করেছেন।

স্বামী সারদানন্দও তেমনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে তিরিশ বছর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকরূপে অকল্পনীয় গুরুদায়িত্ব পালন করে এই সঙ্ঘকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, ''স্বামীজীর পর শরতের মতো এত পরিশ্রম—সারাজীবন মুখ বুজে এমন রক্তক্ষয়ী পরিশ্রম আর কেউ করেনি। এত হাঙ্গামা কেউ পোয়ায়নি।"

শরৎচন্দ্রের এই ভারবহনের ক্ষমতা সম্পর্কে শ্রীমা বলেছেন : ''শরৎ হচ্ছে আমার ভারী। শরৎ ছাড়া আমার ঝক্কি কে পোয়াবে?" একইভাবে স্বামীজীও ছিলেন সারদানন্দজীর ভারবহনের ক্ষমতার উপর আস্থাশীল। ৯ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাওয়ার প্রসঙ্গে লিখছেন, ''পাশ্চাত্য যাত্রার বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য, সারদানন্দ না ফেরা পর্যন্ত তিনি কোনও চিন্তাই করতে পারবেন না, কারণ অপর কারও ওপর তিনি লোকজনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না।" ঠাকুর-মা-স্বামীজীর পরেই সঙ্ঘে যাঁর স্থান, সেই রাজা মহারাজও দৈনন্দিন জীবনে শরৎ মহারাজের ওপরই সর্বাপেক্ষা বেশি নির্ভর করতেন। পুরীতে অসুস্থ হরি মহারাজকে নিয়ে রাজা মহারাজ বিব্রত ও চিন্তিত। কলকাতা থেকে শরৎ মহারাজ গিয়ে

উপস্থিত হলেন পুরীতে। তাঁকে দেখেই রাজা মহারাজ বলে উঠলেন, ''শরৎ, তুমি যখন এসেছ, এইবার আমি নিশ্চিন্ত।'' দ্বিতীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে সঙ্ঘের কোনও সমস্যা নিয়ে গেলেই তিনি বলতেন, ''শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করো, শরৎ মহারাজ যা বলেন সেই রকম করো।''

শুধুমাত্র মা, স্বামীজী বা গুরুভাইয়েরাই নন, পরবর্তী প্রজন্মের সাধু-ব্রহ্মচারী, রাধু, মাকু প্রভৃতি সহ মায়ের বিস্তৃত পরিবার, গোলাপ-মা, যোগীন-মা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে ভক্তজন—সকলেরই 'ভারী'-স্বরূপ, আস্থা ও ভরসার স্থল ছিলেন সারদানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর থেকে শ্রীমাকেই সারদানন্দজী তাঁর একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়স্থল বলে মনে করতেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে : ত্বামাশ্রিতা হি আশ্রয়তাং প্রয়ান্তি—দেবতারা দেবীস্তুতি করতে গিয়ে বলছেন, তোমাকে যে আশ্রয় করে মা, সে-ই আবার সবার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। জগজ্জননীকে সর্বদা ধরে ছিলেন সারদানন্দজী, মাতৃকৃপায় তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হয়ে সর্বনারীতে তিনি জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করতেন। তাই জগজ্জননীর প্রসাদে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সহ সকলের 'ভারী' ও নির্ভরতার স্থল হয়ে উঠেছিলেন।

সারদানন্দজীকে ঠাকুর একবার বলেছিলেন : ''নিজেকে সর্বদাই শিব এবং আমাকে শক্তি বলে ভাববে।'' গম্ভীরানন্দজী ঠাকুরের এই উক্তি প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''সাধারণবুদ্ধি আমাদের পক্ষে এই সমস্ত রহস্যের মর্মভেদ করা অসম্ভব। তবে... সুদীর্ঘ কর্মজীবনে শরৎ যে অদ্ভুত তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাহা নীলকণ্ঠ শিবের পক্ষেই সম্ভবপর—গরল পান করিয়াও অম্লানবদনে আশীর্বাদ করা, নিজের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়াও অনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করা শুধু আশুতোষেরই সাধ্যায়ত্ত।'' তাছাড়া, শিবই তো থাকেন শক্তিকে ধারণ করে এবং এই সঙ্ঘই তো শক্তিরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ওই গূঢ় নির্দেশ মেনে 'শিবস্বরূপ' সারদানন্দজী সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণকে তিরিশ বছর ধরে নিজ বক্ষে ধারণ করে ছিলেন সঙ্ঘের সম্পাদকরূপে।

শরৎ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে এসে পৌঁছলেন, নরেন তার কিছু আগে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। শরৎ এসে পৌঁছনোর পর থেকেই ঠাকুর ব্যাকুল : নরেনের সঙ্গে যেন শরতের পরিচয় হয়। সেই পরিচয় হওয়ার সংবাদ যেদিন ঠাকুর পেলেন, সেদিন সহর্ষে মন্তব্য করেছিলেন : ''গিন্নী জানে, কোন হাঁড়ির মুখে কোন সরা রাখতে হয়।'' শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্ঘলীলায় এই দুজনের ভূমিকার পারস্পরিক অপরিহার্যতা এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, পরবর্তী কালে মিস ম্যাকলাউড পর্যন্ত বলেছিলেন, ''It is Saradananda that Ramakrishna always coupled with Swamiji, Swamiji being the cup, Saradananda the saucer, the cup and saucer.'' চায়ের কাপ ও সসার (যাকে আমরা এখন 'প্লেট' বলি) এই দুটি নিজ ভূমিকায় থাকে বলেই তো চা-পিপাসুর চা-পান সম্ভব হয়। তেমনি, নিজের অবতারলীলায় যে-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের এই সঙ্ঘসৃষ্টি, সেই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে স্বামীজী ও সারদানন্দজীর যুগ্ম ভূমিকায়। তাই শ্রীশ্রীমায়ের যিনি 'মাথার মণি' সেই শরৎচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের 'মাথার মণি' নরেন্দ্রনাথের কাছে উপহার দিয়েছিলেন—যাতে তাঁর যুগধর্ম পালনে তাঁর শ্রেষ্ঠযন্ত্র নরেন্দ্রনাথের চির-সহযোগী হতে পারেন শরৎচন্দ্র। স্বামীজী নিজমুখে বলেছেন, ''(ঠাকুর) শরতের ভার আমার উপর দিয়েছেন।'' সারদানন্দজীর ভারবহনের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত

ছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর 'মিশন' সম্পাদন করার জন্য শরৎচন্দ্রকে নেতা নরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন; এবং ''বিবেকানন্দ-উত্তরকালে স্বামী সারদানন্দ সঙ্ঘের সেবাব্রতের রথটি দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে চালনা করেছিলেন, আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রসূত দূরদৃষ্টির সাহায্যে প্রয়োজনমতো সেই রথের রাশ ধরে রেখেছিলেন। ... সঙ্ঘের সেবাকর্মবিকাশের ইতিহাসে এই কালটি স্বর্ণযুগ বলে স্বীকৃত।''

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর পরই এটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, স্বামীজী সারদানন্দজীর ওপর কতটা নির্ভর করেন। তাই মিস ম্যাকলাউড প্রমুখ বিদেশিনী ভক্তরা নিজেদের মধ্যে সারদানন্দজীকে উল্লেখ করতেন Swami II অর্থাৎ দু-নম্বর বা দ্বিতীয় স্বামীজী বলে। মা বলেছিলেন : নরেনের পর শরতের মতো এরকম হৃদয়বান মানুষ বাংলাদেশে নেই, ভারতবর্ষে নেই, সারা পৃথিবীতে নেই। মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, ''আমাদের সঙ্ঘে দৈহিক শক্তিতে স্বামীজীর পরেই শরৎ।'' প্রকৃতপক্ষেই, বহুমুখী গুণাবলিতে গুরুভাইদের মধ্যে স্বামীজীর পরেই সারদানন্দজীর স্থান। বিদ্যাবত্তা, হৃদয়বত্তা, বাগ্মিতা, সাহিত্যপ্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কার্যকুশলতা, মিষ্ট ব্যবহার প্রভৃতি গুণাবলি তাঁর স্বামীজীরই সদৃশ, শুধু প্রকাশের ধরন স্বাভাবিক নিয়মেই ভিন্ন। এছাড়াও তাঁর আর একটি গুণ ছিল যা স্বামীজীর ছিল না—স্বামীজীরই দেওয়া অভিধায় সেটি হল তাঁর 'বেলে মাছের রক্ত, যা কিছুতেই তাতে না।' কেউ এই মানুষটিকে কখনও উত্তেজিত বা বিচলিত বা রূঢ় বা ক্রুদ্ধ হতে দেখেনি। সারদানন্দজী যখন লন্ডনে, গুডউইন তাঁর সঙ্গে একমাস ছিলেন। সারদানন্দজী সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা হয়েছিল, তা তিনি মিসেস বুলকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন। চিঠিটির প্রাসঙ্গিক অংশ বঙ্গানুবাদে এই : ''এককথায় বলতে গেলে, তিনি (সারদানন্দজী) একটি ভাল মানুষ। ভাল মানুষ বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায়, একেবারে তাই; এবং তাঁর উপস্থিতি ও সান্নিধ্যকে আমি, স্বামীজীর সান্নিধ্যের মতো হুবহু একইরকম সহায়ক (helpful) বলে মনে না হলেও, প্রায় সেরকমই সহায়ক বলে মনে করি।''

তাঁর তিন দশকের সম্পাদক-জীবনে তিনি যেসব কঠিন কাজ করেছেন বা যেসব ঝড়-ঝাপটা সামলেছেন, তার প্রধান কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরই নিবেদিতার রাজনৈতিক- জীবন সঙ্ঘের কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠল। কারণ, আর তো স্বামীজীর বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব স্থূলশরীরে নেই! কাজেই, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের হাত থেকে সঙ্ঘকে রক্ষা করতে বাহ্যিক দিক দিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল। নিবেদিতা নিজেই পত্রিকায় ঘোষণাটি করলেন। এতদিন নিবেদিতা

নিজের পরিচয় দিতেন—'নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ মিশন' বলে। এখন পরিচয় দিতে শুরু করলেন : 'নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' বলে। কিন্তু কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী নিবেদিতার রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগের সঙ্গে বিবেকানন্দ-হীন রামকৃষ্ণ মিশনের পথভ্রষ্ট হওয়া কল্পনা করে পত্র-পত্রিকায় অনেক বিষোদ্গার করলেন; দুঃখিত ও লজ্জিত নিবেদিতা তাদের কাল্পনিক অভিযোগের সাধ্যমতো প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু বিষোদ্গার ও বিরূপ সমালোচনা চলতেই থাকল। এই সম্পূর্ণ ঝড়টির মোকাবিলা করলেন ব্রহ্মানন্দজী আর সারদানন্দজী।

আর একটি সংকট এল সাধুদের ভেতরেই। স্বামীজীর অকস্মাৎ প্রয়াণে শোকাহত হয়ে অনেকেই কর্মজীবন ত্যাগ করে তপস্যায় চলে যাওয়ার সংকল্প করলেন। সারদানন্দজী তখন রাজা মহারাজজীর সঙ্গে পরামর্শ করে সব সাধুদের ডেকে একটা সভা করলেন। তাঁদের বোঝালেন : স্বামীজী তাঁদের উপরই সঙ্ঘের গুরুদায়িত্ব দিয়ে গেছেন। সেই দায়িত্ব বহন করা তাঁদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। তার দ্বারাই স্বামীজীর আশীর্বাদ ও প্রসন্নতা লাভ সম্ভব। সারদানন্দজী জানতে চান : তিনি স্বামীজীর মনোনীত সেক্রেটারি; তাঁকে কে কে সাহায্য করতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ কে কে সঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চান আর কারাই বা শুধু তপস্যায় অতিবাহিত করতে চান। তিনি নিজে অন্তত পাঁচ বছর সঙ্ঘের কাজ করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অধিকাংশ সন্ন্যাসীই সম্মত হলেন সঙ্ঘে থেকে স্বামীজীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' ব্রতে জীবন উৎসর্গ করতে।

বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল এই সময় তাঁর দরবার ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত যুবকদের একটি আশ্রয়স্থল বলে ঘোষণা করলেন। এর ফলে রাজরোষের ভয়ে অনেকে রামকৃষ্ণ মিশনে আসা বন্ধ করে দিলেন। অনেকে পরামর্শ দিলেন, যেসব সাধু-ব্রহ্মচারী আগে রাজনীতি করত তাদের সঙ্ঘ থেকে বের করে দিতে। শ্রীশ্রীমা তা নিষেধ করলেন। ব্রহ্মানন্দজী তখন দক্ষিণ ভারতে। মায়ের পরামর্শে সারদানন্দজী কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোঝাতে সমর্থ হলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন আদ্যন্ত একটি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান, তার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সংস্রব নেই। এরপরে কারমাইকেল আরও একটি বিবৃতি দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর থেকে সন্দেহ প্রত্যাহার করে নিলেন। এরপরও বেলুড় মঠের উপরে একই বিপদ এসেছে। রাজনৈতিক সন্দেহে বেলুড় মঠকে বেআইনি ঘোষণা করার কথাবার্তা পর্যন্ত চলতে থাকে উচ্চতম সরকারি-মহলে। অপরদিকে ইস্টার্ন রেল কর্তৃপক্ষ বেলুড় মঠের দক্ষিণ দিকের বেশ কিছু জমি নিয়ে নেবে বলে ঠিক করে। সারদানন্দজী লাটসাহেবকে একটি চিঠি দিলেন আর মিস ম্যাকলাউডকে বললেন এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে। মিস ম্যাকলাউড বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে বললেন : আমেরিকায় বিবেকানন্দের বহু গুণগ্রাহী আছে। তাঁর স্থাপিত বেলুড় মঠ বন্ধ করে দিলে আমেরিকায় এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হবে। বড়লাট সব শুনে নোট দিলেন : যুদ্ধের সময় আমেরিকার বিরাগভাজন হওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তাই বেলুড় মঠ বন্ধ না করে সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে সেখানে নিয়োগ করতে হবে যারা বেলুড় মঠের সাধুদের গতিবিধির উপর সর্বক্ষণ নজর রাখবে। মঠের জমি-অধিগ্রহণের প্রসঙ্গটিও মিস ম্যাকলাউডের হস্তক্ষেপে খারিজ হয়ে যায়।

স্বামীজীর দেহত্যাগের দু-একদিন পরেই আমেরিকা ছেড়ে তুরীয়ানন্দজী পাকাপাকিভাবে ভারতে চলে আসেন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্যই ফিরছিলেন, কিন্তু জাহাজেই স্বামীজীর দেহত্যাগের খবর পান তিনি। শোকার্ত তুরীয়ানন্দজী

আর কখনও সক্রিয় কর্মজীবনে অংশ নেননি। তুরীয়ানন্দজীর স্থলাভিষিক্ত করে আমেরিকায় পাঠানো হল স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে, যিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকরূপে এতদিন সুন্দরভাবে পত্রিকাটি চালাচ্ছিলেন। তাঁর জায়গায় শুদ্ধানন্দজী সম্পাদক হয়ে কয়েক বছর চালান। কিন্তু ১৯০৮ থেকে ১৯১২ এই চারটি বছর লোকাভাবে স্বামী সারদানন্দজীই তাঁর অন্যান্য সমস্ত দায়িত্বভারের সঙ্গে 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার দায়িত্বও নেন। এটি তাঁর অমানুষী ক্ষমতারই পরিচায়ক। সঙ্ঘের মুখপত্র হিসেবে 'উদ্বোধন' পত্রিকাটি এইসময় উৎকর্ষের উচ্চভূমিতে ওঠে।

মাতৃগতপ্রাণ সারদানন্দজী মনে খুব কষ্ট পেতেন যখন তিনি দেখতেন যে মা জয়রামবাটীতে থাকেন ভাইদের সংসারে আর কলকাতায় এলে ওঠেন হয় ভাড়াবাড়িতে, নয়তো ভক্তদের বাড়িতে। কোনও জায়গাতেই মায়ের নিজস্ব কোনও থাকার জায়গা নেই। স্বামী সারদানন্দজী টাকা ধার করে বাগবাজারে সঙ্ঘজননীর থাকার জন্য একটি দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। বাড়ির নিচের তলাটি 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য এবং উপরতলাটি মায়ের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট হয়। ১৯০৯ সালের ২৩ মে মা এই বাড়িতে পদার্পণ করেন। বাড়িটি তারপর থেকে 'মায়ের বাড়ি' নামে সাধু-ভক্তদের মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠে। কয়েকবছর পরে জয়রামবাটীতেও তিনি মায়ের জন্য একটি নতুন বাড়ি নির্মাণ করেন।

স্বামী সারদানন্দজীর অনন্য কীর্তি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' রচনা। গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও জীবনভাষ্য। ধর্মজগতে তথা সাহিত্যজগতে গ্রন্থটি একটি অনবদ্য সংযোজন। এই গ্রন্থরচনার তিনটি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ মানুষের মনে ক্রমবর্ধমান। অথচ তখনও পর্যন্ত কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল না। উদ্বোধনে যেসব প্রবন্ধ আসত, তাতে ঠাকুরের জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে অনেক ভুল ও আজগুবি তথ্য থাকত। এদিকে ঠাকুরের শিষ্য ও প্রত্যক্ষদর্শীরাও একে একে লোকান্তরিত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে ঠাকুরের একটি প্রামাণিক জীবনী লেখার বিশেষ প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। আর একটি কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, ''মাস্টারমশায় (শ্রীম) তখন খুব বলে বেড়াচ্ছেন, ওরা ঠাকুরের প্রকৃত জীবন ভুলে অন্য পথে চলছে।'' এই অভিযোগের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন। আর একটি চিন্তাও এই গ্রন্থরচনার পেছনে কাজ করেছে। 'মায়ের বাড়ি' তৈরি করতে যে-ঋণ হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থে তা কিছুটা লাঘব করা যেতে পারে। গ্রন্থটির 'ভাবমুখে থাকা' এবং 'অবতারের মানবভাব' নামক তত্ত্ব দুটি অধ্যাত্মজগতে নতুন সংযোজন। এই দুই ভাবের আলোকে আমরা শুধু শ্রীরামকৃষ্ণেরই নয়, যে-কোনও অবতারের নরলীলা-রহস্য অনেকটাই বুঝতে পারি।

সারদানন্দজী একদিকে ছিলেন উচ্চ অধ্যাত্মলোকের অনুভবী প্রত্যক্ষদর্শী, অন্যদিকে জাগতিক জ্ঞান-বিদ্যায়ও পারঙ্গম এবং সঙ্ঘজীবনের খুঁটিনাটি কাজকর্মে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের সব লক্ষণ তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট। কোনও অবস্থাতেই তিনি ধৈর্যহারা বা বিচলিত হতেন না। তাঁর লোকব্যবহার সৌজন্যের মাত্রাকে কখনও অতিক্রম করতে জানত না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সবার প্রতি তাঁর ভালবাসা, ছোট-বড় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে মর্যাদা দান এবং অহংশূন্যতা। ধ্যানশীলতা ও কর্মদক্ষতা উভয়েরই সমাবেশ হয়েছিল তাঁর মধ্যে। এই গুণগুলি সঙ্গে নিয়েই তিনি তিন দশক ধরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পরিচালনা করেছেন। তাঁর দুটি-তিনটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি, যা থেকে আভাস মেলে, কোন

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সঙ্ঘের সম্পাদনা করতেন।

''স্বামীজীর সেবাধর্ম যে জপধ্যানের সমান কল্যাণপ্রদ তা আমরা এখনো বিশ্বাস করতে শিখিনি। জপধ্যান করতে গিয়ে যদি আজে-বাজে কথা ভেবে সময় কাটায় তবুও বিশ্বাস করবে, রোগীসেবার চাইতে সে-কাজ অনেক ভাল। আমার কিন্তু মনে হয় জপধ্যান ও সেবা উভয় কাজই আদর্শ বজায় রেখে করতে হবে, তা যে না পারবে তার জপধ্যানেও কোনও ফল হবে না, সেবা করেও কল্যাণ হবে না।'' দৈনন্দিন জীবনে সঙ্ঘের সাধুদের কীরকম মনোভাব নিয়ে চলা উচিত, তা মহারাজের এই উক্তিতে পরিস্ফুট।

পরবর্তী উক্তি-দুটি থেকে বুঝতে পারি, সঙ্ঘের যাঁরা নেতৃস্থানীয় বা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁদের কীরকম জীবনবোধ থাকা উচিত অন্যান্য সাধু সম্বন্ধে, বিশেষত বয়সে যারা ছোট তাদের সম্বন্ধে— ''সকলের আত্মা চিরস্বাধীন বলিয়া তাহার মনে সকল বিষয়ে সর্বদা স্বাধীনতালাভের ইচ্ছার উদয় হয়। যথার্থ নেতা কখন তাহার ঐ স্বাধীনতালাভের ইচ্ছায় বাধা দেন না। কেবল ঐ স্বাধীনতালাভ করিলে যাহাতে সে উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহার চেষ্টাই করিয়া থাকেন।'' আর একবার লিখেছিলেন, ''ক্রোধ, বিরক্তি, কাহারও ত্রুটিতে অসহনীয়তা, মন মুখ এক করিতে না পারা এবং সর্বোপরি প্রেমের দ্বারা না হইয়া কৌশলে সকলকে বশে রাখার চেষ্টা অতি সহজেই আশ্রমভঙ্গের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।''

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তো বটেই, যে-কোনও সন্ন্যাসিসঙ্ঘের জন্যই স্বামী সারদানন্দ সার্থক প্রশাসকের চিরন্তন আদর্শ বা মডেল। সন্ন্যাসীর ত্যাগধর্ম, সন্ন্যাসীর ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা-ঈশ্বরনির্ভরতা-ঈশ্বরপরায়ণতা-রূপ ধর্ম, সন্ন্যাসীর হৃদয়বত্তার ধর্ম— এই সবগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখেও কীভাবে দক্ষ প্রশাসক হওয়া যায়, তার চিরন্তন আদর্শ স্বামী সারদানন্দজী।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ অর্থহীন হয়ে যেত বিবেকানন্দ না থাকলে। তেমনই তুচ্ছ হয়ে যেত বিবেকানন্দের জীবন ও পরিশ্রম, যদি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘভুক্ত তাঁর গুরুভ্রাতারা তাঁর পেছনে না থাকতেন।'' সেই গুরুভ্রাতাদের মধ্যে চারজনের অনন্য জীবন ও কর্মের কিঞ্চিৎ অনুধ্যান আমরা এই প্রবন্ধে করলাম। রাজা মহারাজজী সাধু-ব্রহ্মচারীদের বলতেন : ''আমরা ছাঁচ তৈরি করে দিয়ে গেলাম, তোরা শুধু দাগা বুলিয়ে যা।'' সেই দাগা-বুলানোর কৃত্যে সনিষ্ঠ থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন গত একশো পঁচিশ বছর ধরে পল্লবিত প্রসারিত হয়ে এসেছে নিজ চরিত্র-গাম্ভীর্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে। যুগাবতারের আকাশসম উদার সমুদ্রসম গভীর বাণীসমূহের সার্থক ধারক ও বাহকরূপে বিরাজ করতে আগামী দিনেও সেই একই কর্তব্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্যাগব্রতীদের।

সহায়ক গ্রন্থ

১। *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৫), অখণ্ড

২। স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪)

৩। সংকলক : স্বামী অপূর্বানন্দ, *শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৫)

৪। সংকলক : স্বামী অপূর্বানন্দ, *শিবানন্দ বাণী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২১)

৫। স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০২)

৬। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *প্রেমানন্দ প্রেমকথা* (ক্যালকাটা বুক হাউস : কলকাতা, ১৪১৮)

৭। স্বামী প্রভানন্দ, *সারদানন্দচরিত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২)

৮। *God Lived With Them* (Advaita Ashrama : Kolkata, 1997)

৯। *The Story of Ramakrishna Mission* (Advaita Ashrama : Kolkata, 2006)